ফাঁক

পাঁক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রীডার্স কর্ণার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—২রা অক্টোবর ১৯৫৩

দাম আড়াই টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীঅজিত গুপ্ত
ব্লক
বেঙ্গল অটোটাইপ

কলিকাতা ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র, এম. এ.
প্রকাশ করেছেন আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে ছেপেছেন

শ্রীশান্তিজীবন ঘোষ

বন্ধুবরেষু

সবিনয় নিবেদন

'পাঁক' আমার সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই।

শুধু প্রকাশিত নয়, প্রকাশের উপযুক্ত রচনা হিসাবেও এইটিকেই প্রথম রচনা বলা যেতে পারে।

তার আগে যা লিখেছি তার মধ্যে সম্পূর্ণ কোন উপন্যাস নেই। গল্প কবিতা প্রবন্ধও যা লিখেছি তাও প্রকাশ করবার কোন চেষ্টা কখনও করিনি। প্রকাশ করার যোগ্য বলেই সেগুলিকে মনে হয়নি।

'প্রবাসীতে' প্রকাশিত যে দুটি গল্প দিয়ে আমার সাহিত্য-জীবন সুরু তারও অনেক আগে 'পাঁক' লেখা আরম্ভ হয়েছে।

বাঁধানো রুল টানা খাতায় 'পাঁক' লেখা যখন সুরু করি, তখন আমি স্কুলের ছাত্র।

কথাটা জানাবার মধ্যে কোন বাহাত্নরী নেবার চেষ্টা নেই। কারণ, স্কুলের ছাত্র হিসাবে লেখা সুরু করায় নিজেকে অদ্বিতীয় মনে করবার মত বাতুল আমি নই।

সত্যি কথা বলতে গেলে ছাত্রাবস্থায় লেখা সুরু করেননি এমন লেখকের সংখ্যাই বোধ হয় কম। বরং সে দিক দিয়ে আমি অনেকেরই পিছনে আছি বলা যায়। কারণ চোদ্দ পনের বৎসর বয়সের আগে সাহিত্য রচনার চেষ্টা দূরে থাক, কোন বাসনা পর্যন্ত আমার মধ্যে ছিল না।

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় 'পাঁক' লেখা সুরু করেছিলাম একথাটা, কতকটা সাফাই ও কতকটা প্রয়োজনীয় সংবাদ হিসাবেই জানলাম।

অল্প বয়সের লেখা হিসাবে 'পাঁক' উপন্যাসটিতে দুর্বলতা ও ত্রুটির যে অভাব নেই, সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন। সাফাইটা সেই কারণেই।

কিন্তু সংবাদটারও একটু প্রয়োজন আছে। যত দোষ ত্রুটিই থাক 'পাঁক' উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে

প্রথম যে একটি নতুন রাস্তা খোঁজবার চেষ্টা ছিল একথা নিন্দুকেরাও স্বীকার করেন। সেই নতুন রাস্তার হদিস্ কি করে পেয়েছিলাম তাই বোঝাবার পক্ষে সংবাদটার কিছু মূল্য আছে।

সময়ের গতিকে তুনিয়ায় অনেক কিছু বদলায়। আজ যাতে শির দিতে হয় কাল তারই জন্যে মেলে শিরোপা।

আর কিছু না হোক বাংলা সাহিত্যে প্রগতিবাদী সাহিত্যিক হয়ে বাহাবা পাওয়া আজকাল সহজ হয়েছে বলে শুনতে পাই। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', গল্পে উপন্যাসে কোথাও একটু থাকলেই নাকি প্রগতিবাদের পরীক্ষায় পাশ। শুধু শ্রমিক নয়, শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে তারিফ্ করে তুটো কথা লিখতে পারলেই সাহিত্যের সেরা তক্‌মা!

ব্যাপারটা আমি ঠিক কিন্তু বিশ্বাস করি না। হুজুগের হাওয়া বুঝে হাততালি দেওয়ার মত লোক চিরকালই ছিল, আরো বহুকাল হয়ত থাকবে। কিন্তু তাদের বিচারই সাহিত্য-শিল্পের শেষ কথা নয়। যে-আন্দোলনের গতি ও লক্ষ্য সত্যই সামনের দিকে, তার পুরোহিতদের দৃষ্টি

অন্ততঃ এ মূঢ় গোঁড়ামির উর্দ্ধে না হলে আন্দোলনই নিষ্ফল বলে আমার মনে হয়। তাই, কণ্ঠী নিয়ে কলম ধরলেই চণ্ডিদাস হয়, এ মতের মাতব্বরদের গলাবাজী গ্রাহ্য করবার নয় বলেই আমি মনে করি।

তবু এ কথা ঠিক যে হাওয়া আজ বদলেছে। উপন্যাসের নাম 'পাঁক' হ'লে, লেখকের গায়ে তাই মাখিয়ে সমালোচনা সুরু করার রেওয়াজ অন্ততঃ আর নেই।

আমাদের সময় তাই ছিল।

নির্বিচারে সাহিত্যের পিঁড়ি পাবার আজ যা পৈতে হয়েছে অনেকের কাছে, তাই ছিল তখনকার দিনে পংক্তি থেকে বাতিল হবার মত পরিচয়।

'বাদ' বিসম্বাদ তখনও সাহিত্যে এখনকার চেহারায় দেখা দেয়নি।

তাই সাহিত্যের সিধে সড়ক ছেড়ে নতুন কোন দিকে অভিযান প্রাণ ও মান হাতে নিয়েই সেদিন করতে হয়েছে নিজের দুঃসাহস মাত্র সম্বল করে।

'পাঁক' লিখতে সুরু করার পিছনে সেরকম কোন দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্কল্প ছিল বলতে পারলে ভালোই

শোনাতো বুঝতে পারছি কিন্তু সে বাহাদুরীটুকুও নেবার সৌভাগ্য নেই।

জীবনের এই প্রথম উপন্যাস লিখতে গিয়ে নতুন পথ খুঁজেছিলাম সত্য, কিন্তু দুঃসাহসিক কিছু করতে যাচ্ছি এ মনোভাব যথার্থই তখন ছিল না।

পাঁকের চরিত্র ও পরিবেশ নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারে আপনা থেকেই আমার মন সেদিন অধিকার করেছিল।

স্কুলে যেতে লম্বা একটা আঁকা বাঁকা গলি পেরুতে হ'ত।

সেই গলির একটা বাঁকের পাশে মস্ত একটা নোংরা পুকুর। চার পাশে বেশীর ভাগ নারকেল পাতা আর দু'একটা ভাঙা খোলায় ছাওয়া গরীবদের বস্তি। কলকাতা শহরে ও ধরণের পুকুর-ঘেরা বস্তি এখন আর নেই বললেই হয়।

আমার স্কুল জীবনের সঙ্গে ওই পুকুর-ঘেরা বস্তির ক্রেমিক পরিণতির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। প্রথম যখনকার স্মৃতি মনে আসে তখনই পুকুরটি ভরাট হচ্ছে রাবিশে জঞ্জালে পানায়। স্কুলের নিচু ক্লাস থেকে আমি ওপরে

উঠেছি। পুকুরটি তার মধ্যে ধীরে ধীরে কখন ভরাট হয়েছে, কখন তার ধারের কুঁড়ে গুলো আরো জট পাকিয়ে গলির কাছে ঘেঁসে এসেছে সঠিকভাবে মনে করতে পারি না, কিন্তু বহু বছরের যাতায়াতের পথে ওই বস্তির জীবনযাত্রা অলক্ষ্যে আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে।

পুকুর হারিয়ে বস্তির জীবনধারা যখন গলির বাঁকের সরকারী কলে সীমাবদ্ধ হয়েছে, তখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে আমি পড়ি। সাহিত্য চর্চ্চার আকস্মিক খেয়ালে হঠাৎ একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।

বসলাম ত বটে, কিন্তু লিখব কি নিয়ে?

সবাই যা করে তা না করার, আর সকলের থেকে একটু আলাদা হবার যে ধর্ম জীবনের মজ্জাগত তারই প্রেরণায় বোধ হয় গলির পথে যেতে আসতে যাদের দেখেছি তাদের কথা নিয়ে প্রথম উপন্যাস স্থুরু করলাম।

স্থুরু করলেও এ উপন্যাস নিজের উৎসাহে শেষ বোধ হয় হ'ত না।

বাঁধানো খাতায় লেখা এ উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ অসমাপ্তই বোধ হয় থেকে যেত, ঘটনার যোগাযোগে কয়েকজন বন্ধুর সমর্থন ও উৎসাহ যদি না পেতাম।

একে তখনকার দিনের পক্ষে উপন্যাসের বিষয় বস্তু একটু বিসদৃশ, তার উপর নিজের লেখা সম্বন্ধে নিজের স্বাভাবিকসঙ্কুচিত ধারণা এই দুই কারণে লেখাটি আমি বাতিল হিসাবেই ফেলে রেখেছিলাম।

এ লেখা আবিষ্কার ও জোর করে প্রকাশ করলেন 'কালি-কলমে'র অন্যতম সম্পাদক শ্রীমূরলীধর বসু। 'কালি কলম' অবশ্য তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

মুরলী বাবু,—আমাদের মূরলীদা তখনও স্কুলে মাষ্টারী করার অবসরে সাহিত্যচর্চা করেন। নিজের লেখার চেয়ে পরের লেখা নিয়ে মেতে থাকেন বেশী। অচিন্ত্য, আমি, শৈলজানন্দ ও মূরলীদা তখন নিত্য সঙ্গী।

কথায় কথায় একদিন 'সংহতি' কাগজের জন্যে একটি উপন্যাসের কথা উঠল।

সে 'সংহতি' বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর এখনকার

কাগজ নয়। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পালের সম্পাদিত আর একখানি চটি কাগজ, প্রেস কম্পোজিটারদের একটি দুর্বল শিশু সঙ্ঘ বুঝি তার পেছনে ছিল।

পারিশ্রমিক দেওয়া ত দূরের কথা 'সংহতি'র নাম ডাক ও কিছু নেই যে তাতে লেখা দিলে লোকের চোখে পড়বে।

কিন্তু হারের খেলা খেলবার নিষ্কাম আনন্দ যাদের মধ্যে দেখেছি মূরলীদা তাদের মধ্যে প্রধান একজন। সে খেলায় তিনি অন্যকেও মাতিয়ে তুলতে জানতেন। সংহতির জন্যে তিনি উপন্যাস চাইলেন আমার কাছে। ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে আমার কাঁচা হাতের প্রথম লেখার কথা জানালাম। তাঁর আর তর সইল না। তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ি এসে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি টেনে নিয়ে গেলেন এবং দুদিন বাদে জানালেন 'সংহতি'তে পাঁক বেরুবে।

পাঁক 'সংহতিতে' বার হতে সুরু হ'ল। কতজনের চোখে সে লেখা পড়ল জানি না, কিন্তু বন্ধু বান্ধবেরা তারিফ করলেন।

উপন্যাস তবু শেষ হ'ল না। আমার 'পাঁকে' পড়ে বোধ হয় 'সংহতি'র পরমায়ু শেষ হয়ে গেল।

আমি পাঁকের কথা ভুললাম কিন্তু, মূরলীদা সে পাত্র নয়। শ্রদ্ধেয় বারীন্দ্র ঘোষের হাত বদলে 'বিজলী' সাপ্তাহিক তখন কবি সাবিত্রী প্রসন্নের হাতে গেছে। মূরলীদা যথাচরিত্র তার নেপথ্য সেবায়েৎ। সংহতির 'পাঁক' তিনি 'বিজলী'তে আবার নিয়ে তুললেন। এবং এবারে বিজলীর দীপ্তি অন্ততঃ পাঁকে 'পড়ে নিভল না। উপন্যাস সত্যই শেষ হ'ল।

হাওয়া তখন বুঝি একটু বদলাতে স্বুরু করেছে। নামের দরুণই অযথা গালাগাল যেমন কম খেলাম না, অযাচিত অপ্রত্যাশিত প্রশংসা ও সমর্থনও তেমনি পেলাম নিজের যোগ্যতার অতিরিক্ত।

সমর্থনের একটি নিদর্শন কোনদিন ভোলবার নয়। 'বিজলী' অফিসে অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন একটি চিঠি এল। পোষ্টকার্ডে লেখা কয়েকটি লাইন। 'বিজলী' সম্পাদকের মারফৎ আমায় কাছে লেখা।

প্রশংসা নিন্দা তারপর জীবনে পাইনি এমন নয়। যা পেয়েছি তা আমার আশা আশঙ্কার অতিরিক্তও বলতে পারি। কিন্তু সেই প্রথম চিঠির উদ্দীপনার তুলনা হয় না।

সে চিঠি লিখেছিলেন শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী।

সারা জীবনের লেখায় তাঁর চিঠির যোগ্য জবাব কতটুকু দিতে পারলাম তাই ভাবছি।

কলিকাতা —প্রেমেন্দ্র মিত্র

২রা অক্টোবর ১৯৫৩

—এক—

দুই রণচণ্ডীর আন্দোলনে আস্ফালনে মুচিপাড়া সেদিন দুপুরে সরগরম হয়ে উঠেছে। এমন তাদের রোজই হয়। তবে চড়ক সংক্রান্তির পরবের দিনটায় কাজটা ভাল হয় নি, একথা সকলেরই স্বীকার করতে হবে!

পরস্পরে পরস্পরের সম্বন্ধে কতরকম জটিল, অসাধারণ ও অসম্ভব বিশেষণ কল্পনা করতে পারে, ও গলাটাকে কতদূর পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ করা যেতে পারে, তার পরীক্ষা দিয়ে তখন তারা হায়রাণ হয়ে যে যার নিজের ঘরের চৌকাঠে বসে' একটু বিশ্রাম করছিল।

দুবাড়ীর মাঝখানে জমিটুকুতে বসে' প্রতিবেশীরা এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দুপক্ষের মাম্‌লা শুনে এখন মনোমত মন্তব্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। ন্যায্য কথা বলে বলে' কনে-বৌএর পাড়ায় একটু খ্যাতি ছিল, তার নিজেরও এ-বিষয়ে গর্ব্ব ছিল কম নয়। কনে-বৌ এতক্ষণ নাত্‌নিকে দিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে উকুন বাছাতে বাছাতে ন্যায্য কথা খুঁজছিল বোধহয়; এইবার বেশ একটু ভনিতা করেই বললে, "তোদেরও বলি বাছা, যদি তোদের দুদণ্ডও এক সঙ্গে না বনে, একটু খুঁত পেলেই যদি চুলোচুলি করে' মরিস, তবে কেন দুজনে ফারাক্ থাক্ না! আবার গলাগলি করবার দরকার কি?"

তিনকড়ির বৌ কেউটের মত ফোঁস্ করে' উঠে বল্লে, "কে গলাগলি করতে যায়, কে ? আমার কি মরবার দড়ি কল্‌সি জোটে না, উই শতেক্-খোয়ারীর সঙ্গে গলাগলি করতে যাব ?"

কালাচাঁদের বোন পাঁচি, এতক্ষণ চৌকাঠের উপর বসে' মুখ ফিরিয়ে পচা-পুকুরের দিকে চেয়ে ছিল, এইবার মুখ ভেংচে বল্লে, "না, গলাগলি করতে যাবি কেন ? 'ও পাঁচি, দুটো পয়সা দিতে পারিস ? ও পাঁচি, দুটো বেগুন ধার দিবি ?'—তখন যে সোহাগ আর ধরে না , আজ সকালে যে নেকী সেজে চাল চেয়ে নিয়ে গেছিস্ ! এখনো যে সে ভাত হজম হয়নি ! আবার ফুটানি করিস্ কিসের ?"

ঝগড়া হলেই এই ধারের খোঁটাটা পাঁচি প্রত্যেকবার দেয়, খোঁটাটাও সত্যি, তাই বড় লাগে। তিনকড়ির বৌ ক্ষেপে উঠে সকলের দিকে চেয়ে বল্লে, "শোন, তোমরা গো সবাই—এক কুণ্‌কে চাল দিয়ে—তাও ধার, ভালোখাকীর খোঁটা শোন। তবু যদি তোর নিজের ঘর থেকে দিতিস্ পাঁচি, তবু যদি না ভায়ের ঘরের ঢেঁকি হতিস্ !"

ভাই-এর ঘরে ঢেঁকি হয়ে থাকার লজ্জাটা পাঁচি নিজেই বড্ড বেশী করে' বুঝত, তাই এই নিদারুণ খোঁচাটা তাকে পাগল করে' তুললে। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে' বললে, "তোর বাবার কিরে মাগী ? আমি আমার ভাই-এর ঘরের ঢেঁকি আছি তাতে তোর বাপের কি ? তোর বাপের খাই আমি,

না পরি? আ বেহায়া, লজ্জাও হয় না! ধার করে খেয়ে, কোঁদল করতে আসিস্! কেন তখন ভায়ের ঘরের ঢেঁকির কাছে হাত পাত্‌তে আসিস্! মর্ মর্, গলায় দড়ি দে!”

তিনকড়ির বৌ এর উপযুক্ত জবাব দিলে, “আমি মরতে যাব কেন লা, কিসের দুঃখে, আমি ত আর ভাতারের মাথা খেয়ে তিনকুল পুড়িয়ে বসে নেই ডাইনি থুবড়ি হয়ে! যে মরলে সকলের হাড় জুড়োয় সে মরুক।”

এবার পাঁচি আর সহ্য করতে পারলে না, আঁচল চোখে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভেতর চলে গেল।

কনে-বৌ চুল থেকে নাত্‌নির হাতটা সরিয়ে বললে, “কিন্তু যাই বল বাপু, তোমার মুখখানির বড্ড ধার!”

তিনকড়ির বৌ খেঁকিয়ে বল্লে, “ও আমার বাপ তুলবে কেন? আমি বল্‌তে পারি না?”

“আমি বাপু নেয্য কথা বলবো, তাতে রাগই কর আর যা-ই ভাব। তুমি ত আগে ওকে ভাই-এর ঘরের ঢেঁকি বলেছ, তবে না ও বাপ তুলেছে। আর আজকের পরবের দিনটায় ওই কথাগুলো বলা ভাল হয়েছে তোমার? বলুক না সবাই।”

নিজেদের বিরুদ্ধে না হলে কনে-বৌএর ন্যায্য কথা সকলেরই ন্যায্য লাগ্‌ত। সুতরাং সকলে সায় দিলে।

তিনকড়ির বৌ নিজের বিরুদ্ধে সকলকে সায় দিতে দেখে জ্বলে উঠে বল্লে, “হ্যাঁ গো ভালো-বলুনীরা, সব জানা আছে।

আমারই যত দোষ। তোমায় ত কেউ গায়ে পড়ে মোড়লনী হতে ডাকেনি বাপু! বেশ করেছি বলেছি।"

"আহা' মুখ নয় ত যেন আঁস্তাকুড় !"

"আমার মুখ আঁস্তাকুড়ই ত বটে! ওই মুখের জ্বালায় ভাতারকে জ্বালিয়ে খেয়েছিস্, ভাই-ভাজ দূর করে দিয়েছে, জোয়ান বেটা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে,—আমার মুখ ত আঁস্তাকুড় বটেই!" বলে' উত্তরের অপেক্ষা না করে' তিনকড়ির বৌ ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

বাইরে থেকে ষাট্ বছরের কনে-বৌ রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধরে চীৎকার করে' বল্‌তে লাগ্‌ল, "অত দেমাক্ সইবে না আহ্লাদীর মা। গোমরে ফেটে পড়ছিস্, চোখে কাণে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, ভগবান এর বিচার করবে...... ।"

তখন সহরের রাস্তায় রাস্তায় চির-ভিখারী ইতর ছোট জাতের দল বচ্ছরকার পরবে মদ খেয়ে, সং সেজে, ঢোল বাজিয়ে বিদ্‌ঘুটে চীৎকার করতে করতে করতে গাজন-সন্ন্যাসী সেজে চলেছে।

—দুই—

কালাচাঁদ বাপের দিলদলিয়া মেজাজটা পেয়েছিল, কিন্তু বাপের টাকাগুলো পায় নি। বাপের ঠন্‌ঠনেতে চটিজুতোর দোকান ছিল, নগদ রোজগারও ছিল, তাই এক-মেয়ে পাঁচির বেশ ভাল ঘরেই সে বিয়ে দিয়েছিল দশ বছর বয়সে, আর এক-ছেলে কালাচাঁদকে কোন বায়নায় সে বাধা দেয় নি। কিন্তু বাপ মরবার পর হঠাৎ কোথা দিয়ে দোকান-পত্র সব বেহাত হয়ে গেল কেমন করে, কাঁচাবুদ্ধি কালাচাঁদ কিছুই বুঝতে পারলে না। তার দু'বছর না ঘুরতে ঘুরতেই বোন বিধবা হয়ে শ্বশুড়-বাড়ি থেকে মার খেয়ে ঘাড়ে এসে চাপ্‌ল। কালাচাঁদের মোটেই ভাল লাগ্‌ল না, তবু বোনেরও অকুলে কেউ নেই—যায় কোথা!

কালাচাঁদ ছেলেবেলাটা কাটিয়েছে তার মত ফচ্‌কে দোস্ত্‌দের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় বিড়ি বার্ড্‌সাই খেয়ে, খাইয়ে, চার-আনা-বার-আনা চুল ছেঁটে, আদ্ধির পাঞ্জাবী গায়ে নিয়ে, গলায় রুমাল বেঁধে ইয়ার্কি দিয়ে। বিশ বছর বয়সে বাপ হারিয়ে বোনকে ঘাড়ে করে' সে দেখ্‌লে এত দিন ধরে' শিখেছে শুধু রসাল রসিকতা করতে, আর ফুটবল খেলোয়াড়দের কুষ্টি নির্ভুল আউড়ে যেতে, রেসের ঘোড়া, জকীর পরিচয় আর থিয়েটারের সখীদের

নাম নিয়ে লাফালাফি করতে। না পারে একটা জুতোর স্থুক্‌তালা দিতে, না জানে একটা চামড়ার দর করতে।

কুছপরোয়া নেই!

ইয়ার বন্ধুরা বল্লে, একটা বিড়ির দোকান দে।

ঠিকবাত!

যা-কিছু বাপের নগদ ছিল সব দিয়ে হ্যারিসন রোডের ফ্যাক্‌ড়া এক গলির ভেতর বিড়ির কারখানা খুলে বস্‌ল। বন্ধুরা দরদ করে' বিড়ি পাকাতে ও আড্ডা দিতে এসে জুট্‌ল, স্থুতরাং বিড়ির দোকান দুমাসেই উঠে গেল।

বাপের যে ঘর ছিল তার ভাড়া বেশী। জিনিষ-পত্র কতক বিক্রী করে' কতক বয়ে এনে কালীঘাটের মুচিপাড়ায় এঁদো পুকুরের পাশে—স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে জল ওঠে—এমন দুটি কুট্‌রী-ওলা ঘরে এসে ভাইবোন উঠ্‌ল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই, পেট আছে।

ভাই-এর অহরহ মুখনাড়া খেয়েও নিজের গাণ্ডে পিণ্ডে গেলবার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে না পেরে, নিজের মাক্‌ড়ী বিক্রী করে', তাগা বন্ধক দিয়ে, মরা মায়ের দেওয়া দড়ি-হারটা পর্য্যন্ত বাঁধা রেখে পাঁচি বছরখানেক চালালে যাহোক করে'। কিন্তু এমন করে' আর কতদিন চলে? অবশেষে যেদিন সব শেষে চাল ডাল বাড়ন্ত হ'ল, সেদিন সে ভোর বেলা উঠে হাঁড়ি কলসি নেড়ে

আবার বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্‌ল, ময়লা বালিশের ভেতর রুক্ষ চুল সমেত মাথাটা গুঁজে।

কালাচাঁদ হরিনাম সংকীর্ত্তনী সভায় সারা সকালটা হারমনিয়ম বাজিয়ে গান গেয়ে শ্রান্ত হ'য়ে দুপুর বেলা ঘরে ঢুকে বললে, "ভাত বাড়্ পাঁচি।" তারপর দেয়ালের পেরেকে টাঙান শিশিটা পেড়ে তাতে এক ফোঁটা তেল নেই দেখে বিরক্ত হয়ে শিশিটা মাটিতে ফেলে তেলচিরকুট ছেঁড়া গামছাটা নিয়ে রুক্ষ মাথাতেই চলে গেল পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আস্‌তে।

সংকীর্ত্তনের গানটাই গুণগুণ করে' গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে দেখে তখনও ভাত বাড়া হয় নি। চেঁচিয়ে বল্লে, "শুন্‌তে পাস্‌নি কালামুখী, কখন যে ভাত বাড়তে বলেছি।" সমস্ত সকাল চেঁচিয়ে ক্ষিদেয় তার নাড়ী জ্বলে যাচ্ছিল।

পাঁচি বিছানা থেকেই উত্তর দিলে, "আমি রাঁধতে পারিনি, আমার অসুখ করেছে।"

ঠিক দুপুর বেলা, পেট তখন জ্বলছে, কথাগুলো কালাচাঁদের গায়ে আঙরার ছেঁকার মত ছ্যাঁক্ করে' উঠ্‌ল।

দাঁত খিঁচিয়ে সে বললে, "রাঁধিস্ নি কি রকম? ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করেছি কোন দিন দেখেছ? আমার জ্বর হয়েছে রাঁধতে পারিনি তাই।"

"রাঁধতে পারিনি তাই! আমি খাব কি? কই তোর জ্বর হয়েছে কি রকম দেখি?"

পাঁচি বিছানার ওধারে আরও সরে গিয়ে বললে, না না, দেখ্‌তে হবে না, আমার জ্বর হয়নি, যাও।"

"জ্বর হয়নি তবে ন্যাকামি হচ্ছে কেন? রাক্ষসের মত গিল্‌তে পার ত' খুব, ভাত রাঁধতেই গতর নেই! নিজের পেটটি হলেই হ'ল? আমি এখন খাব কি?"

ঠিক দুপুর বেলা ক্ষুধা-কাতর ভাইকে দুটি খেতে দিতে না পেরে তার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পাঁচির বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তার যে উপায় নেই; অবুঝ ভাই বোঝে না ত খাওয়াটা কোথা থেকে আসবে! সে চুপ করে' রইল তাই। ভাই শুক্‌নো মুখে না খেয়ে বেরিয়ে যাবে তাও ভাবতে পারছিল না, অথচ তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গালি-গালাজ করবে তাও সওয়া যায় না।

বোনের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে কালাচাঁদ আরও রেগে উঠে বললে, "কথা কস্‌নে যে!"—তবুও কোন উত্তর নেই। ক্ষুধা ও রাগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

"রাঁধতে পারিস্ নি ত বেরো আমার বাড়ী থেকে, এখুনি বেরো। নইলে লাথিয়ে বের করে দেব।"

এইবার পাঁচি কথা বল্লে, "বেরুবার জায়গা থাক্‌লে তোমার মত ভাইয়ের কাছে কেউ পড়ে থাকে না ইচ্ছা করে'।"

"তা বল্‌বি বই কি! নেমকহারাম আর কাকে বলে? মুখে পোকা পড়্‌বে পাঁচি, মুখে পোকা পড়্‌বে।"

"ভাই না হলে অমন শাপ আর কে দেবে বল।"

"দেব না শাপ! কেন দেব না শুনি? তুই কি আমার বোন রে রাক্ষসী? বোন হলে ঠিক দুপুর বেলা না খেতে দিয়ে আমায় গালাগালি দিয়ে দূর করে দিতে পারতিস্‌? দূর তোর ঘর-কন্নার নিকুচি করেছে।"

শেষ কথাগুলো কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে' ঘরের কোণের হাঁড়িগুলোয় একটা লাথি মেরে কালাচাঁদ বেরিয়ে যাচ্ছিল। পরের পর সাজান খালি হাঁড়িগুলো কাত্‌ হয়ে ভেঙ্গে গেল। থমকে সেই ভাঙ্গা খালি হাঁড়িগুলোর দিকে খানিক চেয়ে কালাচাঁদ হন হন্‌ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচি লাথির শব্দে চম্‌কে উঠে একবার সেই দিকে চেয়ে একটা উদ্যত প্রতিবাদ দমন করে' আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়্‌ল। কান্না চাপ্‌বার প্রবল চেষ্টায় তার পাতলা দীর্ঘ দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

* * * *

সন্ধ্যা হয়ে আসে আসে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে এর মধ্যেই। ময়লা পুকুর থেকে একটা পচা শ্যাওলার গন্ধ আস্‌ছিল রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাস ভারি করে'। পাঁচি

ধড়মড় করে' বিছানা থেকে উঠে বস্‌ল দুস্বপ্ন দেখে। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায় নি। উস্কো-খুস্কো চুলগুলো মাথার উপর ঝুঁটি করে' বাঁধতে বাঁধতে সে উঠে দাঁড়াল।

বাঃ, আচ্ছা মন ত তার! ভাই সকালে না খেয়ে গিয়েছে, এবেলাও কি খেতে পাবে না নাকি!

ভাঙা হাঁড়িকুঁড়িগুলোর দিকে চোখ পড়ল!

কিন্তু জুটবে কোথা থেকে? পাড়ায় ধার করে' আন্‌বে? কোথায়—কার বাড়ী হাত পাত্‌বে? সকলেই ত তারই মত গরীব! আর ছিদাম মুচির মেয়ে হয়ে সে যাবে হাত পাত্‌তে! না খেয়ে মরে যাবে সেও ভাল। কিন্তু না পাতলেই বা চল্‌বে কেন? কাল যদি-বা যায় পরশু এমনি করে থাক্‌লে হাত পাততে হবে না? কিন্তু ধার দেবে কে? কনে-বৌ ন্যায্য কথা বল্‌তে পারে, ধার দিতে পারে না। আর কেনই-বা দেবে? সে এ পর্য্যন্ত কাকে কি দিতে পেরেছে? সেদিন হরির মেয়ে এক ছটাক সরষের তেল চাইতে এসেছিল, ঘরে থাক্‌তেও তাকে বল্‌তে হয়েছিল—নেই। নিজেদেরই এত দিন কি করে' চালিয়েছে ভগবান জানেন শুধু। কিন্তু আর বাঁধা দেবার মতও কিছু নেই।

ভাঙা হাঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাঁচি খুঁজ্‌তে গেল।

কি থাক্‌বে আর? তন্ন তন্ন করে' সব খুঁজে—খোঁজবার

মধ্যেও ত ঐ ভাঙ্গা কাঠের বাক্সটি!—কিছু পাওয়া গেল না। না, উপায় নেই, উপোস করে থাক্‌তেই হবে। ভাই রাগ করে' বেরিয়েছে, হয়ত আজ আর আসবে না; কিন্তু কাল সকালে ত আর আপনি চাল এসে জুটবে না!

হতাশ হয়ে চৌকাঠের উপর গিয়ে পাঁচি বসে পড়ল। পাতিহাঁসগুলো সামনের পুকুরে পাঁকের ভেতর খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওপারে চৌধুরীদের বাড়ীর পেছনে সূর্য্য অস্ত গেছে। আকাশময় সোনালী রঙ কে লেপে দিয়েছে যেন; বারান্দার কোণে একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী মেয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে পুকুরের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূর'—মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বেশ সুন্দর!

ও কি চোখ মুচছে যে! হ্যাঁ চোখ মুছছেই ত। তাই ত! অমন রূপ, অমন সাজ-পোষাক যার—অমন বড় লোকের মেয়েরও দুঃখ আছে? তারাও কাঁদে?

মেয়েটা চলে গেল। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যাচ্ছে না।

ওই কে গান গাচ্ছে না? ওই মেয়েটাই বোধ হয়। বেশ গায়। কি গাইছে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে দুটো কথা, 'এস, এস'।

গান থেমে গেল।

বাঃ, খুব মেয়ে ত সে! এই কি গান শোনবার সময়? কিন্তু

কি করবে ? বাঃ, এতক্ষণ কথাটা মনে হয় নি, আর এমন সোজা কথাটা। তার নিজের হাতে থাকতে সে আকাশ পাতাল হাত্‌ড়ে মরেছে! কিন্তু মাদুলি কি দেওয়া যায় বন্ধক ? শেষকালে মাদুলি বন্ধক দেবে ? ঠাকুর দেবতার জিনিষ—আবার কি সর্ব্বনাশ হবে কে জানে—না, না! না খেয়ে শুকিয়ে—দাদা কিন্তু সেই সকাল থেকে না খেয়ে আছে, আবার রাতে এসেও খেতে পাবে না ? ওই দাদা—যে এক দণ্ড ক্ষিদে চেপে থাক্‌তে পারত না! বাড়ী মাথায় কর্‌ত একটু দেরী হলে! সে-ই না খেয়ে আছে, তার ওপর কড়া কথাগুলো শুনে গেছে। খুব বন্ধক দেওয়া যায়, একশ' বার যায়, আর দেবতাই ত নিজে এমন কথা তার মাথায় উদয় করালেন ; তা না হ'লে হঠাৎ তার এমন কথা মনেই বা হবে কেন ? ঠিকইত!

হাতের মাদুলিটা টেনে ছিঁড়তে গেল। পারলে না, দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে সেটা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে পাঁচি বেরুল।

যাক্ ভগবান এখন দু'দিনের ভাবনা তবু ঘুচিয়েছেন। আজ বিকালের রান্না এখুনি চাল-ডাল এনে চড়িয়ে দেবে, দাদা এসেই খেতে বসে যাবে।

* * * *

সন্ধ্যা উত্‌রে বেশ একটু রাত হয়েছে। কালাচাঁদ ভেতরে ঢুকে ডাক্‌লে, "পাঁচি!"

সেইটেই রান্নাঘর, সেইটেই ভাঁড়ার, সেইটেই পাঁচির শোবার ঘর। উনুনের পাশে কেরোসিনের ডিবেতে রোজ আলো জ্বলে। আজ ঘর অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে, কোন সাড়াশব্দও না পেয়ে, কালাচাঁদ আবার ডাকলে, "পাঁচি!"

পাঁচি কান্নাগলায় অস্ফুটস্বরে বল্লে—"কি?"

—মাদুলি কেউ বন্ধক রাখতে চায়নি, সকলে বলেছে, বাছা ঠাকুর দেবতার জিনিষ নিয়ে কি ছেলেখেলা চলে? সত্যি কথাইত!—পাঁচির আগেই একথা ভাবা উচিত ছিল। অন্ধকার ঘরের কোণে ঠেস্‌ দিয়ে পাঁচি সেই কথাই বোধ হয় ভাবছিল।

কালাচাঁদ শান্তস্বরে বললে, "আলো জ্বালিস্‌নি পাঁচি!" পাঁচি অবাক হয়ে গেল, গলায় আদরের আভাস দেখে। কিন্তু ভুল শুনেছে ভেবে আস্তে বললে, "না, ইচ্ছে হয় নি।"

"তেল আছে?"

পাঁচিকে বলতেই হল 'না'।

কালাচাঁদ অন্ধকারে হাতড়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। পাঁচি অবাক হয়ে দাদার কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছিল। এই সকালে ঝগড়া করে না খেয়ে গিয়ে দাদা ফিরে এসে কড়া কথা বল্‌লে না, রাগ দেখালে না, খেতে চাইলে না, আবার ডিবে নিয়ে তেল আনতে বেরিয়ে গেল, এর মানে কি?

কালাচাঁদ ভিতরে এসে ডিবে জ্বেলে একটু ইতস্ততঃ করে' বল্লে, "তোর অসুখ করেছে পাঁচি?"

পাঁচি দস্তুর মত অবাক হয়ে বললে, "না, কেন বলত?"

"না, জিজ্ঞেস করছি যে আজ ভাত রাঁধতে পারবি এবেলা?"

পাঁচি এবার একটু রেগেই বল্লে, "কবে আমি ভাত বাঁধতে কাতর হয়েছি, দাদা, আর কবেই-বা তোমায় তার জন্যে সাধতে হয়েছে আজ সকালে কেন যে রাঁধ্তে পারি নি—"

পাঁচির কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কালাচাঁদ অধীর হয়ে বললে, "রাগিস্ কেন পাঁচি? বলছিলুম কি, আজ একটা কাজ পেয়েছি কি না, এই দশ আনা পয়সা আজকের রেখে দে।"

—তিন—

মুচি পাড়ায় কালাচাঁদের মত কুড়ে ফুর্ত্তিবাজ আরো থাকলেও তিনকড়ির মত খাটিয়ে কেউ যে নেই, এটা সকলে মান্‌ত। সকাল থেকে রাত্তির বারটা পর্য্যন্ত অমন এক নাগাড়ে গাধার মত খাট্‌তে কেউ কখন পারে না বলে' মুচিপাড়ার মেয়ে পুরুষের বিশ্বাস। তবু মুচিপাড়ার মধ্যে যদি কারু সব চেয়ে ক্যাঙালীর হাল থাকে, তবে তিনকড়ির। এ রহস্যের অবশ্য কেউ মীমাংসা করতে পারেনি। তিনকড়ির বৌটা নচ্ছার, একেবারে লক্ষ্মীছাড়া আখ্‌খুটে এ আর কে না জানে! তা' হলেও তিনকড়িও উপায় করে মন্দ নয়—ভালোই করে বল্‌তে হবে, চামড়ার বাক্স তৈরী করে'।—তবে ওর ছেলেপুলেগুলোর অমন হাল কেন?

মুচিপাড়ার কারুরি কিছু নেই। কিন্তু না থাকারও তারতম্য আছে, তা' যা'র অনেক আছে সে বুঝবে না। তিনকড়ি দিনরাত হাড়-ভাঙা খাট্‌লেও কেন যে তা'র ছেলেপুলেগুলো হ্যাংলা কুকুরের অধম হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, তা'র বৌ-এর হাতে দু'গাছা কেমিকেলের চুড়িও জোটে না ও তা'র নিজের একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যে একটু স্ফুর্ত্তি কর্‌বার ফুর্‌সৎও থাকে না, এটা একটা সমস্যা বটে। তিনকড়ি তা'র ছেলেপুলে বৌ নিয়ে কালাচাঁদের

ঢের পরে কিছুদিন হ'ল এসেছে ; কিন্তু এর মধ্যে সবাই জানে, আহ্লাদীর মা একটা আখ্‌খুটে দজ্জাল মাগী আর তিনকড়ি একটা ধাঁধাঁ।

আহ্লাদীর মা এসে প্রথম ভাব করে পাঁচির সঙ্গে। পাঁচি পুকুরের কোলের জমিটায় চ্যাটাই-এ করে' তেঁতুল শুকোতে দিয়ে ঘরের ভিতর গিয়েছিল। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে নতুন পড়্‌শির নোংরা পেট্‌-মোটা ন্যাংটা মেয়েটা আর তার হাড্ডিসার ছোট ভাইটা দু'হাতে সেই তেঁতুল তুলে মুখে পুরছে। তিনকড়ির বৌ গোবরের গাদায় ব'সে তখন ঘুঁটে দেবার যোগাড় কর্‌ছিল। পাঁচি "এই!" বলে' একটু হাঁক্‌ দিতেই সেও ফিরে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখে পাঁচির দিকে একটা জ্রূকুটি হেনে সেই গোবর লেপা হাতেই ছুটে এসে মেয়েটার হাতটা মচ্‌কে ধরে' বললে,—"খেতে পাস্‌ না হারামজাদী, আঁস্তাকুড়-কুড়োনো ছাই-এর তেঁতুলে হাত দিতে গেছো?—তেঁতুল শুকোতে দেবারও জায়গাও পায়নি, পথের মাঝে কেনা জায়গা পেয়েছে!"

মুখের লালা-লাগা তেঁতুলটা মেয়ের হাত থেকে মা'র হাতের খানিকটা গোবরসমেত তেঁতুলগুলোর ওপর গিয়ে পড়্‌ল। পাঁচি এই অপ্রত্যাশিত কুঁতুলেপনায় রেগে গিয়ে একটা পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পেট-মোটা মেয়েটা মচ্‌কানো হাতের বেদনায় 'উ-হু উ-হু' করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। তা'র ওপর তা'র গালে তিনকড়ির বৌ ঠাস্‌ করে' এক চড় কসিয়ে দিলে।

পাঁচি গিয়ে মা'র হাত থেকে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে চ্যাটাই থেকে আরো গোটা কতক তেঁতুল তা'র ভাইটার হাতে দিয়ে একটু ঠেলে দিয়ে বল্‌লে,—"যা এখান থেকে শীগ্‌গির স'রে যা।"

তিনকড়ির বৌ হতভম্ব হ'য়ে পাঁচির কাণ্ডকারখানা দেখছিল। তা'র বয়সে এমন কাণ্ড সে কখন দেখেনি। লম্বা পাৎলা ছুঁড়িটার দিকে সে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল।

তারপর তা'দের ঝগড়া কোঁদল অনেকবার হয়েছে, দিব্যি গেলে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু টেঁকেনি বেশী দিন। যে মুখরা আহ্লাদীর মাকে পাড়াশুদ্ধ লোক চিনে দূরে রেখে চল্‌ত তা'র সঙ্গে পাঁচির মত মুখ-বোজা চাপা মেয়ের গলাগলিও যত আশ্চর্য্য, ঝগড়াটাও তেম্‌নি অদ্ভুত লাগত সকলের। কালাচাঁদ এখন ষষ্ঠী মিস্ত্রীর সঙ্গে যোগাড়ে হ'য়ে যা' হোক কিছু দিন গেলে কামিয়ে আনে, পাঁচির রাত গেলে সকালে কি কর্‌বে তাই ভেবে জেগে আর রাত কাটাতে হয় না। দাদাকে ষষ্ঠী মিস্ত্রী আশ্বাস দিয়েছে শীগ্‌গিরই রাজের কাজে তালিম করে' নেবে; পাঁচি এখন মার দেওয়া হার ছড়াটা খালাস কর্‌বার কথাও ভাবে, দাদার বিয়ে দেবার স্বপ্নও দেখে। আহ্লাদীর মা'র নিত্যি অভাবে সে যা' যখন পারে তাই দিয়ে একটু আধটু সাহায্য করে, আর মনের কথা দুঃখের কথা বল্‌বার এই প্রায়-সমবয়সী প্রতিবেশিনী পেয়ে কাজ-কর্ম্মের অবসরে গল্পগাছাও করে। আহ্লাদীর মা যা যখন চেয়ে নেয়, ধার ব'লেই নেয়, কিন্তু পাঁচি

জানে সে ধার কত শোধ হবে! পাঁচি কিন্তু ঝগড়া হ'লে মরিয়া হ'য়ে ধারের খোঁটাটা মাঝে মাঝে দেয়, না দিয়ে পারেনা।

তিনকড়ি অল্প কথার মানুষ। সাতাশ বছর বয়সে সে বুড়োর মত গম্ভীর। সে বোধ হয় কোন ঝগড়ায় ধারের খোঁটাটা শুনেছিল। পরবের আগের রাতে বৌকে শুধু তাই বলেছিল,—"কালাচাঁদের বোনের কাছে কিছু নিওনা আর। নিজের যা' আছে তা'তে চালাতে পার ভালো, নইলে উপোস করে' থেকো।"

বৌ চটে' উঠে জবাব দিয়েছিল—"কে নিতে যায় কে?—ধার মানুষ করে না?"

"যে ধার শোধ কর্‌তে পার না, সে ধার না করাই ভাল"—বলে' মুখ বুজে পাশ ফিরে সেই যে তিনকড়ি শুয়েছিল অর্দ্ধেক রাত স্বামীর এ অন্যায় উপদেশের বিরুদ্ধে এক্‌লা তর্ক করে গাল দিয়েও তার মুখ থেকে আর একটা কথাও বা'র কর্‌তে না পেরে আহ্লাদীর মা বেশ চটেই তার পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল। মনের রাগটা কারুর ওপর ঝাড়তে না পেরে তা'র দম্‌সম্ হচ্ছিল। এমন সময় আহ্লাদী আর শশী দাঁত বের ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সাম্‌নে এসে দু'টো পয়সা দু'জনে তুলে বল্‌লে,—"মাসি দিয়েছে, মা, মাসি পাব্‌নি দিয়েছে, এই দেখ্।"—আর যায় কোথায়?

হঠাৎ আনন্দের উচ্ছ্বাসের মাঝখানে অকারণে বিষয দু'টো চাপড় খেয়ে তারা দু'জনে অবাক হ'য়ে কান্না সুরু করে' দিলে।

"চুপ কর, ফের্ ষাঁড়ের মত গলা বা'র করছিস্?"—বলেই আহ্লাদীর মা দু'জনের মাথা ঠুকে দিলে।

কিন্তু তাদের গলা পঞ্চম থেকে সপ্তমে উঠল।

ঘর থেকে তাদের কান্না শুন্‌তে পেয়ে পাঁচি ছুটে এসে দু'জনকে কোলের ভিতর টেনে নিয়ে বল্‌লে,—"আজ পরবের দিন সকাল বেলাটা আর না ঠ্যাঙালে চল্‌ছিল না, না? চল্‌রে তোরা আমার ঘরে চল্, মা ভারী বজ্জাৎ।"

ঝট্‌কা মেরে ছেলে-মেয়েকে টেনে নিয়ে আহ্লাদীর মা বল্‌লে,—"থাক্ থাক্, ঢের হ'য়েছে, আর আদিখ্যেতা কর্‌তে হবে না; তোমায় বাপু ভাল কথায় বলে দিচ্ছি, আমার ছেলে-মেয়েকে তুমি আর পয়সা-কড়ি দিও না কখনো।"

পাঁচি অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলে-মেয়ে দু'টোর হাত দু'টো মুচ্‌ড়ে পয়সা দু'টো ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আহ্লাদীর মা বল্‌লে,—"নিয়ে যাও তোমার পয়সা, আমরা গরীব আছি, গরীবই থাক্‌ব। তোমার পয়সা বেশী থাকে, বিলিয়ে দাও, আমাদের ভিক্ষে দিতে ত তোমায় ডাকিনি।"

ছেলে-মেয়েগুলো মার খাওয়ার জ্বালার ওপর পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃখে দ্বিগুণ উচ্চৈস্বরে চীৎকার সুরু করে দিলে।

"ভিখিরী দেখ্‌লেই মানুষ ভিক্ষে দিয়ে থাকে, না ডাক্‌লেও দিয়ে থাকে"—বলে ছেলে-মেয়ে দুটোর দিকে চেয়ে পাঁচি বেরিয়ে গেল।

এই থেকে ঝগড়ার সূত্রপাত, আর দুপুরে তার পরিণতি।

রাত্তিরে স্ফূর্ত্তি শেষ ক'রে বাইরে সব কথা শুনে এসে কালাচাঁদ বললে বেশ একটু চড়াগলায়, ভারি দাতা হয়েছিস পাঁচি! আমি মুখে রক্ত তুলে পয়সা উপায় ক'রে আনছি, আর তুই দানছত্র খুলে ব'সেছিস্! আমার এত কষ্টের পয়সা নিয়ে অত বড়মানুষী করা চল্‌বে না বাপু, তা ব'লে দিচ্ছি।"

পাঁচি গম্ভীর স্বরে বললে,—"আমার ভুল হ'য়েছে দাদা।"

পাঁচি এই সুরে কথা কইলে কালাচাঁদ থই পায় না। সুতরাং গতিক ভাল নয় দেখে সে চুপ করাই যুক্তিযুক্ত ঠিক করলে।

—চার—

ভাল ক'রে ভোর না হতেই কনে-বৌ দরজার কাছে এসে ডাকলে "ও পাঁচি, ঘুমোচ্ছিস বোন্? দরজাটা একবার খোল না।"

পাঁচি ঘরের ভেতর থেকে বললে, "দরজা খোলাই আছে, এস।"

নীচু অন্ধকার স্যাঁৎসেতে একটা ছোট কুটুরী ; ওপরে পাতার চাল ; অন্ধকার না হলে দেখা যেত উনুনের ধোঁয়ার ঝুলে কালো হ'য়ে গেছে—অনেক গরুর গোয়ালও এর চেয়ে ঢের ভাল। তার একধারে আর একটা দরজা বন্ধ ছিল, সেটা দিয়ে কালাচাঁদের ঘরে যাওয়া যায়। দরজাটা এত অপরিসর ও নীচু যে কোন সুস্থ সবল লোকের তার ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা নির্য্যাতন বিশেষ। সৌভাগ্যক্রমে যাদের এর ভেতর দিয়ে যাতায়াত ক'রতে হয়, তারা দু'এর কোনটাই নয়—অন্নাভাবে, অতিশ্রমে ও অত্যাচারে।

কনে-বৌ ঘরের ভেতর ঢুকে বললে, "কাল এত কাণ্ড হ'য়ে গেছে বোন আর কিছু টের পাই নি! যত বয়স বাড়ছে তত মড়ার মত ঘুম হচ্ছে। কিন্তু ধন্যি মেয়ে তুই বাবা! তুই না থাকলে কাল কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত বল ত'!"

পাঁচি কাঁথাটা গায়ে দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল, কথা কইলে না।

"তুই বুঝি আগেই দেখতে পেয়েছিলি? তখন কত রাত্ত হবে? —প্রায় তিন পহর, না?

"হ্যাঁ।"

"আগুন দেখেই তুই বুঝি ছুটে গেছলি? অত বড় মিন্‌সেকে আগুনের ভেতর থেকে টেনে বার করে আন্‌লি···তোর ক্ষমতাও ত' কম নয় পাঁচি! সবাই ধন্যি ধন্যি ক'রছে। তুই অত আগে না চেঁচিয়ে ডাক্‌লে কি আর ও-আগুন নেবান যেত, সব ছার-খার হ'য়ে যেত!"

"তুমি কোথায় শুনলে?"

"কোথায় আবার শুনব! পাড়াশুদ্ধ লোকেই ত' জানে। তিনকড়ি হাতের জ্বালায় একবার ক'রে কাৎরাচ্ছে আর বলছে, ···সে না থাকলে আমায় আজ কাচ্চা-বাচ্ছা নিয়ে পথে দাঁড়াতে হ'ত।"

পাঁচি কি-একটা কথা জিজ্ঞেস করবে ভেবে খানিক ইতস্তত ক'রে শেষে চুপ করেই রইল।

কনে-বৌ বলে যেতে লাগল, "আমি তা হ'লে ন্যায্য কথা বলি বাপু, ও ছোঁড়ারই-বা কি রকম একগুঁয়ে খেয়াল! সমস্ত দিন খেটে আবার অত রাত পর্য্যন্ত কাজ ক'রতে সব্বাই মানা করছে, আমি কতবার বলেছি শরীরটাকে অমন করে

মাটি করিস নি তিনকড়ি, তা কে কার কথা শোনে! অত রাত পর্য্যন্ত নাগাড়ে কাজ কল্লে মানুষের ঘুম পায় না? ওই যে ঢলে পড়েছিলি অজান্তে, যদি ডিবের তেলটা গড়িয়ে ওদিকে না গিয়ে তোর মাথার দিকেই পড়ত? তোর নেহাৎ ভাগ্যি তাই কেউ দেখতে গেয়েছিল, যদি না পেত—"

পাঁচি অজান্তে একবার শিউরে উঠল কাঁথার মধ্যে।

"তা হ'লে কি হ'ত? আর তুই যে ঘানির গরুর অধম হ'য়ে খেটে মর্‌ছিস্—কি লাভটা হচ্ছে শুনি? যে হাড়ির হাল সেই হাড়ির হালই ত' আছে! পেটে খেতে পাস্ না ভাল ক'রে, একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রবার অব্‌কেশ নেই, ছেলে-পুলেগুলো হ্যাং হ্যাং ক'রে বেড়াচ্ছে,—কি জানি বাপু!"

পাঁচির কালকের ধোঁয়া-আগুনের আঁচ লেগে বুঝি চোখটা একটু এখন কর্‌কর্ ক'র্‌ছিল, এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

"আমি তা হ'লে নেয্য কথা বলি বাপু, ঐ বৌটা এক্কেবারে আখ্যুটে; তা না হ'লে ওদের অমন দশা হয়! বলিস্ কি পাঁচি?—সোয়ামীটাকে একটু ছেদ্দা-যত্ন করে না! খেটে খেটে হাড়-মাস ক্ষ্যায় ক'রে ফেলছে' তা একটু দেখে না। তিনকড়ি যা উপায় করে, তাতে ওর মত দুটো সংসার ভাল করে চলে যায়। আমরা কি আর সংসার করি নি—না জানি নি। এই ত' তুই আছিস পাঁচি, আমি সক্কলকে বলে বেড়াই, —পাঁচির মত মেয়ে এ পাড়া খুঁজলে পাবে না, কি গুছিয়ে

সংসার ক'চ্ছে! দেখে আহ্লাদ হয়। ও ত' আর মুচির মেয়ে নয়! বামুন-কায়েতের মেয়ে শাপ ভেৰ্ষ্টা হায় এসে জম্মেছে।"

পাঁচি চুপ ক'রে রইল।

"তা কি বলছিলুম জানিস পাঁচি? চৌধুরী-গিন্নি বাপের বাড়ী গেছে কি না, তিন দিন বাদে বলেছে ঘুঁটের দামটা দিয়ে দেবে। তা আমি পেলেই দিয়ে দেব, দেখিস—ঠিক দিয়ে দেব! আমায় তিন আনা পয়সা ধার দিতে পারিস?"

"পয়সা ত' নেই দিদি! দাদার দশ দিনের রোজ আটকে পড়ে আছে এখনো পায় নি। আমার হাতে একটি পয়সাও নেই।"

"না হয় এক আনাই দে বোন, আজকের দিনটা গেলে কাল যা হয় দেখা যাবে।"

"সত্যি দিদি, মাইরি বলছি একটা পয়সাও নেই—না হ'লে দিতুম।"

"দেখি তবে, আর কোথায় পাই কি না,"—ব'লে এই অহঙ্কারী মেয়েটাকে মনে মনে গাল পাড়তে পাড়তে কনে-বৌ দরজাটা খুলে রেরিয়ে গেল। তখন বেশ সকাল হ'য়ে গেছে।

পাঁচি উঠল। পুকুরে বড় কেউ নেই! সেই ঘোলাটে শ্যাওলা-পচা গন্ধভরা জলে মুখ ধুয়ে রাঁধবার জল তুলে আন্‌লে।

মুচিপাড়ায় পাঁচি বোধ হয় একটু পরিষ্কার। উনুনটা ন্যাতা ভিজিয়ে নিকোল, একটা পাতলা কাঁসার থালায় ক'রে বর্ম্মার মোটা চাল ধুলে; তারপর নিজের দেওয়া ঘুঁটে বাড়ীর পেছনের ছ্যাল থেকে তুলে এনে, চ্যালা কাঠ কাটারি দিয়ে কেটে আগুন দিয়ে ভাত চড়িয়ে দিলে। দিয়ে, কুট্‌নো কুট্‌তে বসল—দুটো আলু, একটা শুঁটকো বেগুন। কালাচাঁদ গত রাত্রের হাঙ্গামায় অনেক রাতে শুতে গেছল। একটু বেলা ক'রে উঠল; দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই লজ্জায় কালো হয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

পাঁচি তখন দাঁড়িয়ে ভাতের হাঁড়ি নামাচ্ছিল। দাদার দরজা খোলার শব্দ সে পেয়েছিল, জিজ্ঞেস ক'রতে যাচ্ছিল,—আজ ডাল রাঁধবে, না আলু বেগুনের তরকারী হ'লেই হবে? হঠাৎ দাদার লজ্জায় কালো হয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘরে ঢুকে যাওয়ায় চমকে দেখলে—ছি! ছি! ছি! ছি!

ভাতের হাঁড়িটা সশব্দে তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা থেঁৎলে পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল! গরম ফুটন্ত জলে ভাতে তার পায়ে ছেঁকা দিয়ে দিলে। নীচু হ'য়ে কাঁথাটা টেনে নিয়ে সে কোমরে জড়িয়ে সেইখানেই বসে প'ড়ল। হা ভগবান! কালকের আগুন লাগার হট্টগোল, ছুটোছুটি, টানাটানির মাঝে পচা-গলা কাপড়খানির খানিকটা পুড়ে গেছে, আর পেছনের খানিকটা কিসে লেগে এমনভাবে ফালা হ'য়ে ছিঁড়ে গেছে যে, নারীর

তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না—মুচির মেয়েরও না। তখন গোলমালে লক্ষ্য করে নি, সকালে উঠেও সে দিকে নজর পড়ে নি। আর এই কাপড় নিয়ে এতক্ষণ সে পুকুরে গিয়ে মুখ ধুয়েছে, জল এনেছে, ঘুঁটে এনেছে! কিন্তু এই বই আর তার কাপড় নেই যে! এই পচাগলা কাপড়টি শীঘ্রই অকেজো হ'য়ে পড়বে জেনেই সে ক'দিন দাদাকে একটা কাপড় আনতে বলেছিল, কিন্তু দাদাও ত' রোজ পাচ্ছে না কদিন ধরে । আনচে—আনবে ক'রে আর আনা হয়নি। হায়! মুচির মেয়েও যে মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যে না খেয়ে মরে যেতে পারে, তবু তার লজ্জার লাঞ্ছনা সইতে পারে না। কিন্তু কি ঘেন্না! পাঁচি অভিভূতের মত চুপ ক'রে বসে রইল। কাপড় না হয় আর একটা থাকতে নেই; কিন্তু তাই ব'লে সে আগে থাকতে টের পায় নি কেন? আর কেউ যদি দেখে থাকে! যত ভাবছিল তত তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। চাপা কান্না তার গলার গোড়ায় লোহার ডেলার মত ঠেলে উঠছিল। কেন? কি পাপে তার এমন লাঞ্ছনা?

নারীর শুধু দু'দণ্ডের সৌখীন খেয়াল মেটাতে কোটী কোটী প্রাণী জীবনের অপূর্ণ প্রভাতে অন্ধকারে অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, স্তূপাকার বসন ভূষণের আয়োজন—কোটী মানুষের রক্তজলকরা শ্রমের সাফল্য—মুহূর্তের আনন্দ দিয়ে অনাদৃত পরিত্যক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। আবার সেই নারীরই মাত্র লজ্জা

নিবারণের জন্যে একখানি পচা ময়লা পুরোণ কাপড় বই জোটে না!

কিন্তু এখন সে উঠবে কি ক'রে এখান থেকে! ভাত ত নষ্ট হয়েই গেছে! যাক্, কিন্তু উঠে রাঁধবে আবার কি ক'রে?

কালাচাঁদ ঘরের ভেতর ঢুকে ভাতের হাঁড়ি পড়ার শব্দ শুনে বাইরে পাঁচির অবস্থাটা অনেকটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু কি করবে তা ঠিক পাচ্ছিল না। সে ত জানে দুটি বই আর কাপড় নেই ঘরে। যা রোজ পায় তাতে ঘর ভাড়া দিয়ে খেয়ে-দেয়েই কুলিয়ে উঠতে পারা যায় না। তা থেকেই কিছু বাঁচিয়ে অনেকদিন থেকেই ভেবেছিল একটা কাপড় কিনে আনবে। কিন্তু সে ত আনা হয় নি। এখন উপায় কি?

উপায় হল। পাঁচি চুপ ক'রে বসে নষ্ট ভাতগুলোব দিকে করুণ চোখে চেয়ে ছিল। কতকগুলো কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে; অন্যগুলো আবার ধুয়ে যাহোক ক'রে খাওয়া যাবে, কিন্তু—

হঠাৎ কালাচাঁদ নিজের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে হাত দিয়ে কাপড়খানা বাইরে ফেলে দিয়ে বল্লে, "আমার কাপড়টা কেচে দিস্ ত পাঁচি। এখন আর আমায় ভাত না হলে ডাকিস্ নি।—কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি, একটু ঘুমোব।" তারপর সশব্দে দরজার হুড়কো দিয়ে দিলে।

—পাঁচ—

পা দুটোয় কে যেন দু'মণ লোহা চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু না উঠলে ত চলবে না। উঠে সেই কাপড় পরতে হো'ল। তারপর চরণের বৌ-এর কাছ থেকে গিয়ে ছুঁচ সূতো চেয়ে এনে পাঁচি প্রথম নিজের কাপড়খানা যাহোক ক'রে শেলাই করতে বসল। কিন্তু সে পচা কাপড় কি শেলাই হয়? শেলায়ের টানেই সূতো তার ছিঁড়ে যায়! তবু একদিনের মত চলনসই সেটাকে পাঁচি ক'রে নিলে, তারপর রান্নার যোগাড় করতে গেল। দাদার মত ভাত যা পড়ে গেছল তাই ধুয়েই হবে, সুতরাং আলুবেগুনের একটা তরকারী চাপিয়ে দিলে।

রান্না হয়ে গেলে থালায় ভাত তরকারী বেড়ে দিয়ে পাঁচি নিজের কাপড়টি পরে দাদার কাপড়টা রেখে দিলে। তারপর "তোমার ভাত বাড়া হয়েছে উঠে যাও, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি"—বলে' দাদাকে ডেকে দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে ফিরে এসে দাদার ভাতের থালার সামনে বসে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, "আজ কি টাকা কটা পাবে দাদা?"

"হ্যাঁ, আজ ত' দেবার কথা, এ মাসের ঘরভাড়া আর দিতে পারা গেল না বোধ হয়, একটা কাপড় কিনিতে হবে।"

তারপর আর কেউ কোন কথা বললে না।

কালাচাঁদ গলি দিয়ে বেরুতেই দেখলে সামনে একপাল ছেলে বাঁকাবুড়ির পেছন লেগেছে। সেও উচ্চৈঃস্বরে তাদের পিতৃ-মাতৃ-কুলের উপাদেয় নানা ভোজের বন্দোবস্ত করতে করতে বাঁকা পা দু'খানি থপ্‌থপ্‌ ক'রে ফেলে কদাকার কচ্ছপের মত এগিয়ে আসছে। যাবার পথেই এই কদাকার অষ্টাবক্র মাগীটাকে দেখে তার মনটা অজান্তে বিরক্ত হ'য়ে উঠল। ছেলের পাল তখন শুধু "বাঁকা বুড়ি গো!" ব'লে চেঁচিয়ে তাকে ক্ষেপিয়ে মারছে। শেষে আনন্দ না পেয়ে তাকে ঢিলোতে সুরু ক'রেছে, আর এই হৃদয়হীন অত্যাচারেব কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন পথ না দেখে হতভম্ব নির্ব্বোধ প্রাণীটা স্তিমিত দু'চোখে জল নিয়ে একমাত্র উপায় গালাগাল অবলম্বন ক'রে কাতরভাবে চীৎকার করছে শুধু।

কাজের জায়গায় গিয়ে কালাচাঁদ, মিস্ত্রীকে প্রথমেই জিজ্ঞেস ক'রলে "আজ তারা সব রোজ চুকিয়ে দেবে ত?"

"দেবে না! আজ না দিলে আমার আর চলবে না। না, তারা সে-রকম লোক নয়, দেনা-পাওনা হিসেবে খুব সাঁচ্চা।—ওরে কালাচাঁদ, তোর নসীব ভালো, একটা কাজ ঠিক করেছি

তোর—বার আনা ক'রে এবার থেকে রোজ!" বলে ষষ্ঠী মিস্ত্রী কালাচাঁদের পিঠ্‌টায় একটা চাপড় দিয়ে উৎসাহ দিলে।

কালাচাঁদ মনের আনন্দটা চেপে বললে, "কিন্তু আজ ভাই আমার কিছু টাকা চাই-ই—"

"সে হবেরে হবে! এখন থেকে তুই রাজ হ'তে চল্লি আবার টাকার ভাবনা?" ব'লে, ষষ্ঠী এক চোখ মটকে ইসারা ক'রে হাসলে।

বড়লোকের নূতন বার-বাড়ী মেরামত হচ্ছিল। ষষ্ঠী, কালাচাঁদ, নেত্য ব'লে আর একটা মেয়েমানুষ-যোগাড়ে, আর শিবু মিস্ত্রীই আগাগোড়া কাজ ক'রে এসেছে। কালাচাঁদের প্রথমে মুচির ছেলে হয়ে জাতব্যবসা ছেড়ে রাজের যোগাড়েগিরী করতে বিশেষ লজ্জা হয়েছিল, কিন্তু এছাড়া উপায়ও যে নেই। কালাচাঁদ অন্যদিন কাজ করতে করতে নেত্যর সঙ্গে একটু আধটু রসিকতা ক'রে, স্ফূর্ত্তি ক'রে, ফষ্টিনষ্টি ক'রে নেত্যকে রাগিয়ে আর সকলকে হাসায়, আজ কিন্তু তার বাড়ীর কথা মনে হ'য়ে কিছু ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল টাকাটা পেয়ে কাপড় কিনে বাড়ী গেলে তবে তার স্বস্তি হবে।

বাড়ীর কর্ত্তার দৃঢ় বিশ্বাস ছোট লোক সব বেটা জোচ্চোর, একটু নজর না দিলেই ফাঁকি দেবে, বেটাদের ধর্ম্মজ্ঞান মোটেই নেই। তাই তিনি অধর্ম্মকে প্রশ্রয় না দেবার জন্যে অহরহ হয় নিজে নয় ছেলেপুলে কাউকে দিয়ে চৌকি দিতেন, আর পাজি

ছোটলোকগুলোও এই সতর্কতা ব্যর্থ ক'রে ফাঁকি দিয়ে বাহাদুরী করত—যতখানি পারত। দু'পয়সার জিনিস এনে বলত তিন পয়সার, পাঁচ মিনিটের কাজে কাটিয়ে দিত পোনের মিনিট।

বিকেল বেলা কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। কালাচাঁদের তখন আর কোন কাজ ছিল না, সে চুপ ক'রে বসে ছিল। বাড়ীর কর্ত্তা বসে থাকা দেখতে পারতেন না, পুরো রোজ দিয়ে পুরো কাজ আদায় করা তাঁর মত। তিনি কালাচাঁদকে একটা ফরমাস ক'রে বসলেন। সময় প্রায় হ'য়ে এসেছিল, সুতরাং কালাচাঁদ একটু আপত্তি করলে—কিন্তু অন্যায় আপত্তি খাটবে কেন? তিনি যুক্তি দিলেন, দশ আনার জায়গায় সাড়ে ন-আনা হ'লে যখন সে সন্তুষ্ট হয় না তখন তিনি কোন হিসাবে সময় নষ্ট করতে দেবেন তাকে? বিরক্ত হ'য়ে কালাচাঁদ উঠল, অগত্যা কর্ত্তার আদেশ মত নতুন ঘরে আসবাব-পত্র গুছোতে গেল!

সময় হ'য়ে গেছে। বাইরে ষষ্ঠী ময়লা চাদরটা দিয়ে গায়ের চূণ ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে ডাক্‌লে—"কালাচাঁদ!" কালাচাঁদ বিরক্তহ'য়ে চেয়ারের উপর উঠে ছবিটা টাঙাচ্ছিল। এ ডাকে একটু বুঝি অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল। পেছনের দড়িটা ভাল ক'রে বুঝি পেরেকে লাগেনি। ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ শব্দে ছবিটা মাটিতে পড়ে' দামী কাঁচখানা চুরমার হ'য়ে গেল। ভাঙা কাচের টুকরোয় ছবিটাও বহু জায়গায় গেল ছিঁড়ে।

হাঁ হাঁ ক'রে কর্ত্তা ছুটে এলেন, আর সকলেও এল শব্দ শুনে। এসে দেখে, বিমর্ষ হতভম্ব মুখে কালাচাঁদ দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের ওপর।

"দেখলে, বদমায়েসী দেখলে!"—কর্ত্তা রেগে আগুন হ'য়ে উঠলেন। "জুতিয়ে তোমার খাল খেঁচে দেব শুয়ার, পেজোমী করবার আর জায়গা পাওনি!"

ষষ্ঠী মিনতি ক'রে বললে—"দেখতে পায়নি হুজুর, অসাবধানে পড়ে' গেছে।"

তাকে এক ধমক দিয়ে কর্ত্তা বললেন—"দেখ্‌তে পায়নি! ন্যাকামো? কাজ করতে এসেছেন, দেখ্‌তে পান্ না চোখে!—নাব্ বেটা নাব্ চেয়ার থেকে! আমার অত দামের ছবি নষ্ট করেছিস, তোকে আমি পুলিশে দেব হারামজাদা কোথাকার!"

চেয়ার থেকে নামতে মেঝের একটা কাঁচ ফুটে গেল পায়ে। সেটা বার করতেই ভল্‌ভল্ ক'রে রক্ত বেরুতে লাগল। হারামজাদা শুনেই কালাচাঁদ কিন্তু পায়ের রক্ত ভুলে ব'লে উঠল—"গালাগাল দিও না বলছি বাবু!"

"ছবি ভেঙে আবার রোক্ করবি ত মুখ থেঁতো ক'রে দেব বেটা!—আমোলো—আস্পর্দ্ধা দেখো!"

ষষ্ঠী ইত্যাদি সকলে একসঙ্গে ব'লে উঠল,—আরে চুপ চুপ, হুজুর রাগ ক'রেছেন, এখন কথা কইতে আছে, বোকা কোথাকার!"

কর্ত্তা এবার ষষ্ঠীর দিকে ফিরে বললেন—"কে তোমায় এমন বদমায়েস লোক আনতে বলেছিল? কেন তুমি এমন লোক এনেছিলে? আমি তোমার পাওনা থেকে ছবির দাম কাটব! আমি ত ওকে চিনি না, আমি তোমায় চিনি।"

ষষ্ঠী ভয়ে কাঁচুমাঁচু হ'য়ে বললে—"দোহাই হুজুর, গরীবকে মারবেন না। ও নতুন লোক—অমন বদমায়েসী করবে জানলে আমি আনতুম না। কাজের জন্যে আমায় পেড়াপীড়ি কচ্ছিল বড্ড, তাই এনেছিলুম হুজুর!"

প্রবলের অত্যাচারের ভয়ের মুখে বন্ধুত্বের সমস্ত সম্মান মর্য্যাদা ভেসে গেল।

কর্ত্তা এই মাথানোয়ানো কাকুতিতে মনে মনে খুসী হ'য়ে বাইরে কঠোর ভাব দেখিয়ে বললেন, "তুমি ও-রকম লোক আর আনবে না। আর আমি ওকে এক পয়সা মজুরী দেব না। যে ছবি ও নষ্ট ক'রেছে, ও ছবির দাম পাঁচ শ' টাকা!—একটি পয়সা আমি দেব না"

ষষ্ঠী হাত জোড় ক'রে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"

কালাচাঁদ হতভম্ব হ'য়ে এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এইবার মজুরী না পাবার সম্ভাবনায় মরিয়া হ'য়ে বললে—"বা, আমার মজুরী পাব না কি রকম?"

ফের কথা কইছিস, বেটা পাজী নচ্ছার কোথাকার! তোকে পুলিশে দিচ্ছিনে এই তোর বাবার ভাগ্যি, জানিস্?"

ভেতরে কালাচাঁদের কান্না ঠেলে উঠছিল—সে সেটাকে প্রাণপণে চেপে বললে,—"হ্যাঁ পুলিশে দেবে! অম্‌নি আর কি? আমার মজুরী দিয়ে যাও বাবু!"

কর্ত্তা এই অসভ্য ছোটলোকটার সাহস দেখে অবাক হ'য়ে চীৎকার ক'রে বললে,—"তবু তুই কথা কইছিস বদমাস, দেব না—এক আধলা দেব না, যা তুই যে ক'রে পারিস আদায় ক'রে নিগে যা!"

কোন কথা খুঁজে না পেয়ে কালাচাঁদ পাগলের মত শুধু বললে—"হ্যাঁ, দেবে না বৈকি! দেবে না বৈ কি! আমার হকের মজুরী দেবে না বৈকি!"

এবারে কর্ত্তার বোধ হয় অসহ্য হ'ল, বললেন,—"বেরো আমার বাড়ী থেকে,—দরওয়ান! দরওয়ান!" কর্ত্তা রাগে কাঁপছিলেন।

আর দরওয়ান ডাকতে হ'ল না, ষষ্ঠী শিবুরাই টেনে হিঁচড়ে অনিচ্ছুক কালাচাঁদকে ঘাড় ধ'রে বাইরে নিয়ে গেল। কালাচাঁদ হাত-পা ছুঁড়ে বাজে বক্‌তে বক্‌তে তাদের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাইরে যেতে বাধ্য হল। শুধু এই অন্যায় অত্যাচারের সামনে নীচু হ'য়ে কেঁদে ফেলে ভিক্ষে চেয়ে বলতে পারলে না, কেন তার মজুরীর আজ সব চেয়ে বেশী দরকার! বলতে পারলে না, তার বোনের যে লজ্জা নিবারণের কাপড় নেই! দুটি চাল বিনা তার ঘরে যে হাঁড়ি চড়বে না কাল।

—ছয়—

কালাচাঁদকে বাইরে বার করে এনে সকলে এক সঙ্গে তাকে বোঝাতে বোঝাতে চলল, দামী ছবিটা ভেঙ্গে ফেলে অত তেজ দেখান তোর মোটেই উচিত হয় নি। বড়লোক ওরা ও-রকম অপমান করলে চটে যাবে না? ওরা যদি মজুরী না দেয় কি করতে পারে সে! তার চেয়ে নীচু হয়ে গেলে হয়ত বাবু নরম হ'তে পারত। আর একটু হ'লে সে তাদের পর্য্যন্তও ত ফাঁসিয়েছিল! ষষ্ঠী বিজ্ঞের মত উপদেশ দিতে দিতে চলছিল, বলছিল—"ও-রকম তেজ নিয়ে পয়সা উপায় করা চলে না কালাচাঁদ, আমাদেরও যখন রক্ত গরম ছিল তখন আমাদেরও অমন তেজ ঢের ছিল, কিন্তু অনেক ঠেকে শিখেছি বাপধন, তেজ করলে তেজ নিয়েই থাকতে হয়, পেটে ভাত জোটে না। বাবুদের মর্জ্জি বুঝে যদি না চলতে শেখ তাহ'লে কোনকালে কিচ্ছু হবে না। আর তুমি ত বাপু সত্যিই ছবিটা ভেঙ্গে ফেলেছ! বাবু ভাল লোক তাই অমনি অমনি রেহাই দিয়েছে, নইলে আজ পিঠের চামড়া দাগ নিয়ে বাড়ী ফিরে যেতে হ'ত। কি করতে তুমি বাপু? বড় লোকের সঙ্গে পার্‌তে? আমার সঙ্গে যদি কাজ কর্‌তে চাও ও-সব তেজ-ফেজ ছেড়ে দিতে বাপু!"

শিবু বললে, "কাঁসারিপাড়ার বাবুর কথা মনে আছে ষষ্ঠী?

কি মার খেলে সত্য! তারপর নালিশ করে আদালতে কি নাকালটা হল আবার ত সেই বাবুর হাতে পায়ে ধরে' তবে রেহাই পায়!"

কালাচাঁদ এদের অর্দ্ধেক কথা শুনতে পাচ্ছিল না। সে মুখ গোঁজ করে আপন মনে চলছিল। ছবি ভাঙবার দুর্ভাগ্যের পর এই যে কেলেঙ্কারীটা হ'য়ে গেল তাতে তার দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে মাথার যেন ঠিক ছিল না। পেছন থেকে সাইকেলের বেলের আওয়াজ তাই সে শুনতে পায় নি।

"এইও শূয়ার—ষ্টুপিড্!" সঙ্গে সঙ্গে সজোরে এসে সাইকেলের চাকাটা তার কোমরে লাগল। ভদ্রলোকটি সাইকেল সামলাতে না পেরে কাৎ হ'য়ে পড়ে' গেলেন।

কোমরে বিষম ঘা খেয়ে চমকে পেছনে ফিরে সাইকেল আরোহীকে দেখতে পেয়ে কালাচাঁদ রুখে উঠে আপনা থেকেই বলে ফেললে, "কানা হ'য়ে সাইকেল চালাচ্ছ, দেখতে পাও না শালা!"

দীর্ঘায়তন, বলিষ্ঠ, সুন্দর ভদ্রলোকটির মুখ-চোখ রাঙা হ'য়ে উঠল। রাস্তার অনেকে তখন মজা দেখতে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। —"কি বললি ষ্টুপিড, রাস্কেল?"—বললে ভদ্রলোকটি এগিয়ে গেলেন।

কালাচাঁদের তখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বললে, "ভারী আমার নবাব সাইকেল-চালানে-ওয়ালা এসেছেন। মারবে নাকি?"

ভদ্রলোক একটা কালো ইতর শুক্‌নো মজুরের এত আস্পর্দ্ধা

সইতে পারলেন না, সাইকেলটা ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার গলাটা ধরতে গেলেন। সকলে একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে। ষষ্ঠী, শিবু কালাচাঁদের এই নতুন বেয়াদবী দেখে বিরক্ত হয়ে তাকে আগে থাকতে টেনে ভীড় থেকে বার করে' দিয়ে পথে এগিয়ে দিলে। আরেক জন ভদ্রলোক সাইকেল-আরোহীকে আটকে বললেন, "আরে মশাই, করেন কি, করেন কি—ছোট লোকের সঙ্গে মারামারি করতে যাচ্ছেন?"

তিনি হাত দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে বলেন, "ছেড়ে দিন মশাই, I shall teach him a good lesson."

"আরে মশাই, ছোটলোকের গায়ে হাত তুলে নিজের মান্‌টা খোয়াতে যাচ্ছেন!"—সমবেত সকলেই ভদ্রলোকের যুক্তিযুক্ত কথায় সায় দিলে। ছোটলোককে মেরে শিক্ষা দিতে হ'লেও যে তাকে কিছু সম্মান দিতে হয়! ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করে' কি লাভ? ভদ্রলোকের হাতে মার খাবার উপযুক্ত সম্মানও যে ছোট লোক দাবী ক'র্‌তে পারেনা!

তখন আর এক দল ছোটলোক কালাচাঁদের চারধারে ভীড় করে' তাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নিয়ে যেতে যেতে তিরস্কার কর্‌ছিল —"ছোঁড়া ভারী বদ্‌মাস্ ত!"

"ভদ্রলোক ত পা-গাড়ীর ঘন্টি দিয়েছিল—শুন্‌তে না পেয়ে আবার গালাগাল! আমরা না থাকলে মার খেয়ে মর্‌ত!"

"ফুটানি করবার আর জায়গা পায়নি!"

"তেল হয়েছে তোমার বড়, না ? তেল বেরিয়ে যেত !"

"লৌণ্ডা মাতোয়ালা হ্যায় !"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাইকেল-আরোহী ভদ্রলোক তখন উত্তেজিত হ'য়ে বলছিলেন, "আপনারা ছাড়লেন না, ভালো হলো না, কিন্তু বেটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার ছিল। ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা আজকাল ভয়ানক বেড়েছে। দেখুন না মশাই, বেল্ দিলুম তবু বেটা নড়ে না, আবার গালাগাল—I ought to have given him a good licking—তা হ'লেই ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত !"

ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা ভয়ানক বেড়েছে এ-বিষয়ে একমত হ'লেও তাদের ধরে'মার্‌তে গেলে আত্মসম্মান হারান হয় কি না এ-বিষয়ে আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে জটলা ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছিল।

কালাচাঁদকে বাড়ীর পথে এগিয়ে দিয়ে ষষ্ঠী শিবু নেত্য নিজেদের আড্ডার পানে গেল।

ষষ্ঠীও যখন নিজের বাড়ী চলে' গেল তখন নেত্যকে এক্‌লা পেয়ে একটু ব্যঙ্গ করে' শিবু বললে, "দেখ্‌লি নেত্য, কালাচাঁদের হাম-বড়ামির ফল দেখ্‌লি ? বড় চাল দেখায়, চাল বেরিয়ে গেছে।" তারপর কালাচাঁদের লাঞ্ছনার কথা ভেবে হো হো করে' হেসে উঠল।

কিন্তু কপালে মুখে উল্কি-কাটা চোয়াড়ে-গাল মেয়েটা ভ্রূকুটি করে' শুধু বল্লে, "যাও যাও, তোমাদের মুরোদ বোঝা গেছে—নেড়ি কুত্তার দল !"

—সাত—

কালাচাঁদ যখন সমস্ত দিনের বিশ্রী ব্যাপারগুলো ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনমরা ও অবসন্ন হ'য়ে ঘরে ফিরছিল, তখন সন্ধ্যার আকাশ কালো মেঘে জম্‌কালো হ'য়ে উঠেছে। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই দেখে সেই বাঁকাবুড়ীটা বসে' পাঁচির সঙ্গে গল্প কর্‌ছে। এক পলে তার সমস্ত দিনের দুর্ভাগ্য লাঞ্ছনার কারণ এই কদাকার অপয়া বুড়ীটাকেই মনে করে' তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল। বাঁকাবুড়ী তখন পাঁচির কাছে বসে' নিজের দুঃখ জানাচ্ছিল, কাঁদতে কাঁদতে ছেলেদের ঢিল লেগে যে সব জায়গা ফুলে উঠেছিল তাই দেখিয়ে আঁটকুড়ির পুতেদের সদ্য মরণ কামনা করছিল।

"বেরো মাগী, বেরো আমার বাড়ী থেকে—এখানে তোর কি দরকার ?"

অকস্মাৎ হুঙ্কার শুনে তারা দুজনেই চম্‌কে উঠে অবাক্ হয়ে কালচাঁদের দিকে চেয়ে রইল। জোরে মাটিতে পা ঠুকে কালাচাঁদ বললে, "আভি নিকালো !"

বাঁকাবুড়ী হতভম্ভ হয়ে বললে, "কেন গো ? কি করনু আমি ?"

কালাচাঁদ অধীর হয়ে চীৎকার করে' বললে, "আমার চোখের

সাম্‌নে থেকে শীগ্‌গির সরে' যা অপয়া মাগী। কি করতে মর্‌তে এখানে এসেছিস্ ?"

কালাচাঁদের রুক্ষ মূর্ত্তি দেখে ভয়ে ভয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বুড়ী বললে "ঘাট হয়েছে বাবা, কিন্তু দোহাই ভগবান কোন অপরেধ করিনি—"

"এখানে বক্ বক্ করলে ভাল হবে না বলছি মাগী!" বলে' আর এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে কালাচাঁদ ঝনাৎ করে' শিকলিটা খুলে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

পাঁচি দাদার বেয়াড়া রাগের কোন কারণখুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ;এইবার বললে, "ও তোমার কি ক্ষতি করেছিল যে বিনাদোষে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে ?"

কালাচাঁদ ঘরের ভিতর থেকে উত্তর দিলে, "আমার খুশী।"

"মিছিমিছি একটা অনাথ অথর্ব্ব বুড়ো মানুষের মনে অমন করে' কষ্ট দিলে কখ্‌খন ভালো হয় না।"

তারপর খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। মেঘ করে' থাকায় অসময়েই ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাঁচি বললে, "আমার কাপড় এনেছ ত ?"

কালাচাঁদ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল, আস্তে উত্তর দিলে "না।"

"বাঃ কাপড় আনোনি কি রকম ?"

"আনিনি ; আবার কি রকম ?"

"বাঃ, আমি কি পরব ?"

"জানি না আমি।"

এবাব পাঁচির ভারী রাগ হ'ল ; বল্লে; "জানি না বল্লেই হ'ল ? মজুরীর টাকাগুলো নিয়ে ফূর্ত্তি করে' এলে আর বোনের কাপড় আন্‌বার কথাটা মনেই রইল না ! বাঁদির অধম হয়ে খাটব আমি, আর একটা কাপড় দেবার বেলায় তুমি বলবে জানি না ?—বেশ !"

"কে তোকে বাঁদির অধম হয়ে খাট্‌তে বল্‌ছে ? না পারিস দূর হয়ে যা না, আমার আপদ যায় !"

"যাবার কোন চুলো নেই দাদা, নইলে উঠ্‌তে বস্‌তে তোমার মুখনাড়া খেয়ে এক মুঠো ভাতের জন্যে পড়ে থাক্‌তুম না। মুখপোড়া যমও যে ভুলে আছে !"

পাঁচি আর কান্না চাপ্‌তেপার্‌লে না। দুটো হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে ফুঁফিয়ে উঠ্‌তে লাগল।

সমস্তদিন যত অন্যায় অপমান লাঞ্ছনা সয়েছিল তার জ্বালা যেন কালাচাঁদের মুখ দিয়ে এমনি করে' বিষ হয়ে বার হয়ে যাচ্ছিল। তাই তার একমাত্র স্নেহের পাত্রী এই নির্দ্দোষ, জন্মদুখিনী, অক্লান্ত সেবারতা ছোট বোনটির সমস্ত কাতর কান্না উপেক্ষা করে' সে বলে যেতে লাগল হৃদয়হীনের মত, "তুই কি সহজে যাবিরে সর্ব্বনাশী ! এখনো যে অনেক বাকী। একটা সংসার পুড়িয়ে খেয়ে এসেছিস—এইবার আমায় খাবি তবে ত যাবি। তার দেরী আর বড় নেই। যেদিন থেকে শ্বশুরকুল

ছারখার করে' ঢুকেছিস আমার ঘরে সেই দিনই বুঝতে পেরেছি এইবার······।"

সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশ জুড়ে যে সব কালো কালো মেঘের জটলা আরম্ভ হয়েছিল গভীর রাত্রে তারা বর্ষণ স্থরু করে' দিলে মুষলধারে। কালাচাঁদ ভিজে বিছানায়, গায়ে চালের ফুটো থেকে পড়া জলের ঝাপটা লেগে জেগে উঠল। বাইরে ঝম্ ঝম্ করে' বৃষ্টি পড়ছে। অপ্রচুর-ছাউনি ফুঁড়ে প্রবল জলের ঝাপটায় মেজে বিছানা সব ভিজে গেছে—তবু এই ঘরটাই দুটোর মধ্যে ভালো।

হঠাৎ কালাচাঁদের মনে হ'ল তার ঘরেই যখন এমন হাল তখন পাঁচির ঘর না জানি কি হয়ে গেছে! বেচারী বোনটি তার! একবার তবু সে ডেকেও বলেনি, "দাদা, সব ভিজে যাচ্ছে।" কালাচাঁদ বেরিয়ে দেখলে সমস্ত ঘরটা জলে জলময় হয়ে গেছে—আর সেই ঘরে ভিজে-বিছানায় পাঁচি নিশ্চল হয়ে বসে আছে হাঁটুতে চিবুক রেখে। কেরোসিনের ডিবেটা এক একবার জলের ঝাপটায় নিবু নিবু হয়েও জ্বল্‌ছে। বিছানাটা ভিজে ন্যাতা হয়ে আছে, পাঁচির কাপড় চুলও ভিজে, তবুও পাঁচির ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই বোনই না একদিন তার বাপের বুকের হাড় ছিল! এই বোনেরই না একদিন বিয়ে দিয়েছিল তার বাপ এমন জাঁকজমক

করে' যে মুচিপাড়ায় কেউ তা কখনো দেখেনি! এই বোনই না নিজে আধপেটা খেয়ে না-খেয়ে, গায়ের গয়নাগুলো পর্য্যন্ত খুইয়ে দাদার পাতে ভাত দিয়েছে! মুচির ঘরে কার এমন বোন? আর এই ষোল বছর বয়স থেকেই যার জীবনের সব সাধ ঘুচেছে সেই দুখিনী সর্ব্বসহা বোনটিকে তার, সে কিনা আঘাত দিয়েছে। কেন? শুধু তার আর কেউ নেই বলেই ত! শুধু সে দু'মুঠি ভাতের ভিখিরী বলেই ত! শুধু তার পরবার একখানা কাপড় চেয়েছিল বলেই ত! বুকের নিম্নতম গহ্বর থেকে যেন কালাচাঁদের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ঠেলে উঠল। পৃথিবীব সবাই তার পর, সবাই তাকে ঘৃণা করে, অপমান করে—সে গরীব, সে মুচি, সে দুর্ব্বল, কিন্তু এই যে একটি মাত্র মেয়ে শুধু তাকেই জানে তাকেই ভালবাসে তারই সেবা করে, একে সে কোন্ প্রাণে আঘাত করে? এই বোনটি ছাড়া কে আছে তার, যার কাছে এই নির্ম্মম স্বার্থপর সংসারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে সহানুভূতির আশা সে কর্‌তে পারে?

কালাচাঁদ ডাক্‌লে "পাঁচি!"

পাঁচি চম্‌কে মুখ তুল্লে, তার দুচোখে জল—কেরোসিনের ডিবের আলোয় চক্ চক কর্‌ছে।

কালাচাঁদের চোখ শুক্‌নো ছিল না, বললে, "অমন করে' ভিজে মাটিতে বসে' ভিজলে অসুখ কর্‌বে না?"

—পাঁচি হতভম্বের মত দাদার চোখের পানে চেয়ে রইল।

"আমার ঘরটা তবু শুক্‌নো আছে একটু। আয় উঠে আয়।"

পাঁচি আবার মুখ হাঁটুর ভেতব গুঁজে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল। কালাচাঁদ কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে ধবা-গলায় বললে, "তারা যে মজুরি দিলে না পাঁচি, সাধ করে' কি আমি কাপড় আনিনি, সাধ করে' তোকে গাল দিয়েছি! তারা অপমান করে' তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, আর এক পয়সা দেবেনা, কাজেও নেবে না।"

প্রায় সমস্ত রাত মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে ভোরের সময় আকাশ একটু ক্ষান্ত হ'ল। সমস্ত রাত দুটি দুঃখী ভাই-বোন ভিজে মেজেতে ভিজে কাপড়ে জলের ঝাপ্‌টায় অর্দ্ধেক নেয়ে জেগে কাটালে ভোরের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা? ভোর হ'লে তাদের কি লাভ? পরবার কাপড় নেই। মজুরী পাবার আশা নেই। হাতে কাজও নেই। এখন কতদিন কাজ মিলবে না ভগবান জানেন। কোন্ আশায় তারা ভোরের প্রতীক্ষা করছে? এই বর্ষাকাল এসে পড়ল, চালে পাতা নেই, পুরোনো দেয়ালের মাটী ধুয়ে যাবে—ভাড়া দেবার সংস্থান নেই, মেরামত করবারও ক্ষমতা নেই।

অপরূপ পৃথিবীর মেঘ-ভাঙা ভোরের আলো তাদের ক্লান্ত চোখে অসীম প্রাণ-সমারোহের কোন উল্লসিত স্পন্দন বয়ে নিয়ে এল না।

—আট—

উল্কি-কাটা বাইশ বছরের মেয়েটা ঘুমোতে পারছিল না। টিনের চালে বৃষ্টির মাতামাতি তাকে বিশেষ বিরক্ত না করলেও তার ঘুম আসছিল না। বাইশ বছরের মেয়ের মনে অনেক স্বপ্ন অনেক গানের ভীড়,—বিশেষতঃ বর্ষা-রাতে। কিন্তু সে ত বিদ্যাপতি পড়ে নি, "গীতাঞ্জলি"র নামও শোনে নি। সুতরাং তার মনকে যা' অস্থির ক'রে তুলেছিল তা' "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার" নয়।

কাঁথাটা আর একবার ঝেড়ে সে আবার পাশ ফিরে শু'লো। তা'তেও হ'ল না! উঠে ডিবিয়াটা জ্বাল্‌লে। অপরিষ্কার আলোয় ছোট ঘরটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। শুক্‌নো চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে পড়েছিল—জড়িয়ে একটা আল্‌গা খোঁপা বাঁধলে। তারপর আর কি কর্‌বে ভেবে পেল না। এমন কেন হচ্ছে সে বুঝেও বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না—কেন মনটা কর্‌কর কর্‌ছে—অস্ফুট রাগে না দুঃখে—না দুয়েতেই? হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, ভাঙা টিনের তোরঙ্গটা খুলে, টিনের সস্তা একটা আর্শি বার ক'রে সে মুখ দেখ্‌তে বস্‌ল। অস্পষ্ট আলোয় আর আর্শির গুণে মুখটা অসম্ভব চেপটা ও বেঁকা দেখাল, বিরক্ত হ'য়ে নানা রকম ক'রে ঘুরিয়ে দেখলে মুখটা তেম্‌নি বিশ্রী দেখায়।

আর্শিটা রাগ ক'রে তোরঙ্গে পুরে রাখলে। কিন্তু কেন কে জানে কান্না পাচ্ছিল, কার ওপর যেন অভিমান হচ্ছিল। টিনের চাল কাঁপিয়ে ওপরে বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ হাঁক্‌ছে আর চিকুর খেল্‌ছে থেকে থেকে।

কাল সে একটি বারও কথা কয়নি—তার ওপর অপমানিত হ'য়ে বাড়ী ফিরেছে, আর কাজ করতেও আস্‌বে না······কাল সকাল থেকে ওই ন্যাকা শিবুর ন্যাকাপনা তাকে সহ্য কর্‌তে হবে —বিশ্রী, ভয়ানক বিশ্রী!······

পাশের ঘরে মোটা গয়লানীটা অকাতরে ঘুমোচ্ছিল আর নাক ডাকাচ্ছিল। এমন বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ! নেত্যর ইচ্ছে কচ্ছিল নাকে থাব্‌ড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে আসে। আচ্ছা, সে ত তাকে নিয়ে শুধু ঠাট্টা তামাসাই করে, মরলেও চেয়ে দেখে না —তবে সে কেন মরে তার জন্যে ভেবে? কাল সে অপমানিত হ'য়েছে, রোজ পায়নি—তা'তে তার কি? সেবার যখন ভারা ভেঙে পড়ে' তার নিজের পাটা ভেঙ্গে গেছ্‌ল তখন সে একবারটি দেখ্‌তে এসেছিল কি? সে কত না আশা করেছিল একবারটি অন্ততঃ দেখ্‌তেও আস্‌বে! কিন্তু আসে নি'ত। বরঞ্চ শেষে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল—"খোঁড়া বিবির ঠ্যাং জোড়া লেগেছে?" তবু সে কেন মর্‌তে তা'র জন্যে ভাবে?—

আলোটা মিছি মিছি জ্বলছে। ফুঁ দিয়ে সেটা নিবিয়ে অন্ধকারে ব'সে সে জলের শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌ল। উল্কি-কাটা গরীব

মজুর মেয়ের পিয়াসী বাইশ বছর ঐ বৃষ্টির সুরে অস্পষ্ট করুণ হ'য়ে বাজছিল কি না কে জানে!

*　　　*　　　*　　　*

ভোর হ'য়ে গেছ্‌ল। তবু্ সে জেগে বিছানায় পড়ে' ছিল। আজ আর ওঠ্‌বার কোন আগ্রহ তার ছিল না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল তবু্ মনে হচ্ছিল যাক্‌ গে। দুটো হাতের পাতার ওপর মাথাটা রেখে সে চিৎ হ'য়ে ছাদের দিকে চেয়ে পড়ে' ছিল।

"নেত্য!"

বাইরে থেকে কে ডাক্‌লে! স্বরটা অসম্ভব চেনা তাই বিশ্বাস হ'ল না। বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—"কে? এখন আমি উঠ্‌তে পারি না বাপু্।"

"একবারটি যদি উঠিস্‌!"

নেত্যর বিশ্বাস হ'ল না কিছুতেই—এ যে ভাবা যায় না! উঠে দোর খুলে দেখ্‌লে—সামনে কালাচাঁদ! ঝুঁটি-বাঁধা বিশ্রী খোঁপাটা, রাত্রে শোবার জন্যে পরা ছেঁড়া কুৎসিৎ কাপড়টা, ঘুম থেকে ওঠা ময়লা চেহারার কল্পনা নেত্যর সর্ব্বাঙ্গে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগ্‌ল। সে প্রায় অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—"এস!"

কালাচাঁদ অপ্রতিভের মত ঘরে ঢুকে বল্‌লে,—"বল্‌তে এলুম যদি কাজ-টাজের খোঁজ পাস্‌ খবর দিস্‌।"—গলাটা ধরা!

নেত্য সরু জানালাটা খুলে দিয়ে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—"বোস!"

"না না, বস্‌ব না, শুধু ওই কথাটা বল্‌তে এলুম।"—ব'লে কালাচাঁদ চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

কি একটা কথা যেন তার অসমাপ্ত র'য়ে যাচ্ছে, নেত্য বুঝতে পাচ্ছিল। কাতর হ'য়ে নেত্য বল্‌লে,—"একটু বোস না।"

নেত্যর বুক কাঁপছিল—আনন্দে না বিস্ময়ে সে বুঝতে পার্‌ছিল না! প্রিয়তমের আশাতীত দেখা পাওয়ায় বাইশ বছরের নারীর বুক যেমন করে' কাঁপে তেমন-ই কাঁপছিল, ময়লা কাপড়ের আড়ালে কালো চাম্‌ড়ার তলায়—রক্তরাঙা হৃদয়ের গোপনতায়।

কালাচাঁদ বস্‌ল উন্মনার মত। শুক্‌নো রুক্ষ চেহারা, কাল থেকে বোধ হয় ঘুম হয়নি। নেত্যর ইচ্ছে করছিল লজ্জার মাথা খেয়ে কেঁদে ব'লে ফেলে,—"তোমার শুক্‌নো মুখ দেখ্‌লে কান্না পায়। কেন তুমি আমায় পর ভাব?"

কালাচাঁদ যে জন্যে এসেছিল এখানে এসে আর সে কথা বল্‌তে জোর পাচ্ছিল না—বাধ্‌ছিল। যদি নেত্য বলে,—"না, নেই।" কি অপমান তা' হ'লে!

একটু উস্‌ খুস্‌ ক'রে কালাচাঁদ বল্‌লে, "আর ভাবছিলুম কি, যদি একটা কাপড় তোর বেশী থাকে—পাঁচির পরবার কাপড় নেই কিনা—এই ক'দিনের জন্য দিস্‌, আমি একটা কাজ পেলেই শোধ ক'রে দেব, অবশ্যি যদি তোর অসুবিধে না হয়।"

নেত্যর মুখের কোন উত্তর না পেয়ে কালাচাঁদ মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। খোঁচা না দিয়ে যে কোনদিন কথা কয়নি তার মুখের এই সঙ্কোচে নেত্যর কিন্তু গলা ধ'রে যাচ্ছিল কান্নায়। লোভ হচ্ছিল এই নির্জ্জন ঘরে একবারটি ওর পায়ের কাছে মাথা রেখে বলে,—"তুমি আমায় ঠাট্টা কর, গাল দাও, যা-খুশী তাই বল, কিন্তু অমন কাঙাল-পনা কোরো না, আমি সইতে পারি না।" কিন্তু সে শুধু ধীরে বল্‌লে,—"আছে। তুমি একটু বোস, আমি আস্‌ছি।"

প্যাঁটরা খুলে আবার বন্ধ ক'রে নেত্য বেরিয়ে গেল।

কালাচাঁদ দেয়ালে ঠেসান্‌ দিয়ে ভাব্‌ছিল ছেলেবেলার ফুর্ত্তির আর এখনকার দুঃখের কথা। এই জীবন থেকে কোন দিন রেহাই পাবার কোন আশাও সে দেখ্‌তে পাচ্ছিল না মৃত্যু ছাড়া। —সে আবার কি রকম মৃত্যু?—সহায়হীন—মুখে একটু জল দেবার লোক নেই, একটা মিষ্টি কথা বল্‌বার লোক নেই, যেমন ক'রে তা'দেরি বাড়ীর পাশে হারু বুড়ো মর্‌ছে ময়লা কাঁথায় মল-মূত্রে একাকার পশুরও অধম হ'য়ে। এই ত তা'র পরিণাম! সে শিউরে উঠ্‌ছিল। এই রকম খাট্‌তে খাট্‌তে যে দিন হাড়গুলো পাঁকাটির মত পল্‌কা হ'য়ে যাবে, চামড়া শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে যাবে, নড়বার সামর্থ্য থাকবে না, তখন ধীরে ধীরে মর্‌তে হবে একলা বন্ধুহীন। আর আজ বোনের কাপড় নেই পরবার, নিজের দু'মুঠো ভাতও রোজ জোটে না। আগের জন্মে সে কার মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছিল তাই আজ তার এই শাস্তি!

একটা বড় শাল পাতার ঠোঙায় মুড়ি মুড়কি আর বেগুনি ফুলুরি নিয়ে ঘরে ঢুকে নেত্য কালাচাঁদের কাছে রেখে বল্‌লে,—"খাও।"

চম্‌কে কালাচাঁদ বল্‌লে—"সে কি ? না না!"

"নইলে আমাব মাথা খাও,—খেতেই হবে।"

"পাঁচি কাল থেকে উপোসী··· !"—ব'লে ফেলেই লজ্জায় কালাচাঁদ চুপ ক'বে গেল।

এতক্ষণে নেত্য সমস্ত ব্যাপাবটা বুঝলে ভাল ক'বে। খানিকক্ষণ চুপ ক'বে থেকে বল্‌লে,—"তব্ তুমি আমায় কিছু বলোনি কোন দিন !"

"কি বলব ? আমি কি নিজেই জানতুম !"

"আজকে ত জান্‌তে, আজ এতক্ষণ কোন্ কিছু বলেছিলে ?"

কালাচাঁদ চুপ ক'বে রইল।

নেত্য বল্‌লে, "ওগুলো তুমি খাও।"

"না, আমার ক্ষিদে-টিদে নেই, একটা কাপড় থাকে'ত দাও, তার পববার কাপড় একেবারে নেই।"

"আগে তুমি খাও তারপর দিচ্ছি !"

"আচ্ছা জ্বালাতন—!"

এইবার নেত্য হেসে বল্লে, "তুমি'ত অনেক জ্বলাতন ক'রেছ, আজ না হয় আমি একটু করলুম।"

কালাচাঁদের খাওয়া হ'লে একঘটি জল মাটির কলসি থেকে

গড়িয়ে দিতে দিতে নেত্য বললে, "আমি তোমার সঙ্গে যাব এখনি, একটু বসে' যাও।"

কালাচাঁদ অবাক্ হয়ে বললে, "কেন ?"

"আমার খুশী"—বলে' নেত্য হাস্‌তে লাগ্‌ল। উল্কিকাটা মুখখানাও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কালাচাঁদ কথা খুঁজে না পেয়ে বললে, "বেশিক্ষণ বস্‌তে পার্‌ব না কিন্তু।"

"না গো না, বেশিক্ষণ বস্‌তে হবে না।" নেত্যর মন কালাচাঁদের এই দুঃখের দিনেও খুশী না হ'য়ে থাক্‌তে পারছিল না। এই দুঃখই ত' তাকে এমন ক'রে নেত্যর কাছে টেনে এনেছে! নেত্য তোরঙ থেকে একটা পাট করা ধোয়া কাপড় বার কর্‌লে, একটা টাকা আঁচলে বাঁটলে, তার পর বল্‌লে, "চল।"

কালাচাঁদ এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে নেত্যর কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এইবার বল্‌লে, "বাঃ! তুমি কাজে যাবে না ?"

"না।"

"কেন ?"

"ইচ্ছে নেই।"

"কেন ইচ্ছে নেই ?"

"যদি বলি তুমি যাবে না ব'লে ?"

"বিশ্বাস ক'রবো না।"

নেত্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে,"তাই ত' বলি না।"

"যাই হোক, এ কাজে না গেলে কোন্‌ কাজে যাবে ?"

নেত্যর মুখের বাধা কেটে গিয়েছিল। বললে, "তুমি যে কাজে যাবে।"

"আমার ত কাজ নেই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ ; কবে হবে তাও জানি না।"

"আচ্ছা, সে পরে বোঝা যাবে, এখন চল।"

"না, না, আমার জন্যে কাজ কামাই ক'রতে হবে না। আমি কাপড় নিয়ে যাচ্ছি, তুই কাজে যা।"

"অত ভয় কেন নিয়ে যেতে—বৌ ত' আর ঘরে নেই যে হিংসে ক'রে কোঁদল করবে ?"

দুঃখের মধ্যেও কালাচাঁদ হেসে ফেলে বললে, "না, সে ভয় কোন কালেও হবে না।"

"তবে চল।"

কালাচাঁদের কাছে নেত্যর এই কাজ কামাই করাটা ভালো লাগছিল না। সে বোঝাতে চাইলে। নেত্য কিন্তু অটল। শেষকালে সে বলেই ফেললে যে কালাচাঁদকে যারা অপমান করেছে, তাদের কাছে নেত্য কাজ করবে না কক্‌খনো।

কালাচাঁদ শুধু কাতর চোখে নেত্যর দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। কালাচাঁদ এই রকম একটা কিছুর আভাস আগে পেলেও কোনদিন এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয় নি। আজ এই উল্কিকাটা

মজুর-মেয়েটির নীরব প্রণয় নিবেদন তাকে একেবারে চম্‌কে না দিলেও তাঁর সমস্ত মনটি অপূর্ব্ব রসে পরিপূর্ণ করে' দিলে। এই নিষ্ফল জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ওই মেয়েটির কাতর চাউনিতে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হ'য়ে গেল যেন। যাকে ভাগ্য ঘৃণা করে, ভগবান পায়ে ঠেলে, মানুষ মাড়িয়ে চলে, তারই জন্যে একটি মেয়ের হৃদয় উন্মুখ! অশিক্ষিত মুর্খ কালাচাঁদের মনে অপরিস্ফুট বাণীর সাগর উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তার অর্দ্ধেক মানে সে বোঝে, অর্দ্ধেক তার বুদ্ধির অতীত। সে শুধু বল্‌লে অনেকক্ষণ বাদে, "একি সত্যি, নেত্য?"

নেত্য উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে মুখটা শুধু ফিরিয়ে নিলে।

—নয়—

ভোরের কল্‌কেতার একটা রূপ আছে, ঠিক রূপকথার পুরীর মত সুন্দর। তখনও রাস্তায় লোক-চলাচল বেশি সুরু হয়নি ; গাড়ী ঘোড়ার শব্দ নেই,—ঠিক এমনি সময়টা। এই কল-কেতাকে জানে মাত্র ক'টি প্রানী—প্রাণ দিয়ে জানে যারা, আরো কম তাদের সংখ্যা। এই ভোরের কল্‌কেতার মায়াপুবীতে ঘুরে বেড়ায় নোংরা কাণি-পরা ক'টি ছেলে-মেয়ে, টুক্‌বী-হাতে গত রাতের উনুন থেকে ফেলা ছায়ের গাদায় আর টিনের ঘেরা জঞ্জালের স্তূপে। ক্বচিৎ একটা ময়লার গাড়ী নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চলে যায়। একটা দু'টো ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাড়ু দেয় সকাল-সকাল কাজ শেষ করবার আশায়। আব নইলে একেবারে নিস্তব্ধ। এই ভোরে জঞ্জালের মত সহরের এক প্রান্তে ঝেঁটিয়ে-ফেলা গরীবের রাজ্য থেকে আসে সন্ধানী শিশুর দল সহরের সত্যকার আবর্জ্জনার সম্পদের সন্ধানে। একটা সিগারেটের ছবি, সার্শিভাঙ্গা এক টুক্‌রো নীল কাঁচ, একটুখানি নীল পেন্সিল, ছেঁড়া রঙীন কাপড় একটুক্‌রো,—এর বেশি সম্পদ তাদের কল্পনায় স্থান পায় না। তাদের ইতিহাসে যদিও নানা অদ্ভুত ধন পাওয়ার কাহিনী আছে—কবে মনুয়া দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছিল, কেমন ক'রে কোন রাস্তার কোন কোণে, কাদা-মাখা,—তা' এই

শিশুর দলের প্রত্যেকে জানে। কবে ক্ষ্যান্ত ছায়ের গাদায় সত্যিকারের সোণার আংটি পেয়েছিল, হরে ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল ইত্যাদি অনেক গল্প তাদের কণ্ঠস্থ। এসব গল্প জানা একটা বাহাদুরী, না জানা লজ্জার কথা। ভোরের কল্‌কেতার এই সন্ধানী সম্প্রদায় ছায়ের গাদায় আধ-পোড়া কয়লা কুড়োয়, তারপর সমস্ত দিন আপন খুশীমত ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যায় বড় রাস্তার মোড়ে ভদ্রলোকের হাতে পায়ে ধ'রে পয়সা ভিক্ষে ক'রে। ভিক্ষে করবার বুলি আওড়াতে যে যত তালিম তার তত খাতির। যে মেয়েটার ছোট শিশু ভাই কি বোন আছে, সে ভাগ্যবতী। এই কিশোর সম্প্রদায় সহরে অজান্তে বেড়ে ওঠে, কেউ চোব হয়, কেউ গাঁটকাটা, কেউ পতিতা, কেউ কুলি। ভাগ্যক্রমে কেউ-বা আবার উতরে যায়, খাট্‌তে শেখে, ঘর-সংসার কবে। কেউ ফিজিতে চালান যায়—কেউ আফ্রিকায়, কেউ চা-বাগানে। আবার নতুন দল তাদের জায়গা দখল করে।

রাস্তার বে-ওয়ারিশ কুকুরগুলো তাদের চেনে। তারা যে মানব-সমাজের বে-ওয়ারিশ মাল! তাদের সঙ্ঘ আছে, শাসন আছে, আইন আছে, কানুন আছে। নিয়ম ভাঙলে তারা শাস্তি পায়। তাদের মিশ্র ভাষা হিন্দি বাঙলা—আট্‌কায় না কোনটাই। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধিও আছে তাদের। প্রথম নিয়ম, আগে যে রাস্তা যাবা নেবে সে রাস্তা তাদের। কারুর বা মৌরশী রাস্তা আছে। রাস্তার চৌমাথাগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ

করা। এক জনেদের মোড় আরেকজনেরা নিতে পারে না। নিজেদের ভেতর তাদের আইন,—যে বাবু একজনকে এক পয়সা দিয়েছে, তাকে সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে। না দেখালে হরতাল তার সঙ্গে। তাদেরও বিধি আছে, যথা,—ময়লার গাদায় হাত দেবার আগে যদি কাকের ডাক শোনা যায়, তা' হ'লে কিছু মিলবে না।—যে রাস্তার ধূলোয় পাখীর পায়ের দাগ সে রাস্তা অপয়া। বাদলার দিন বাবুরা বেশি পয়সা দেয়। ইত্যাদি।

দশ বছরের আহ্লাদী আর ন'বছরের শশী প্রত্যহ সকালে ভাঙা চুবড়ি নিয়ে বেরোয়। এর মধ্যেই শশী সমস্ত গালাগালে দুরস্ত হ'য়ে তাদের দলকে চমকে দিয়েছে। আহ্লাদীও এর মধ্যে ছোট্ট দু'বছরের হাবাকে কোলে ক'রে বেশ দু'পয়সা ভিক্ষে করতে পারে। কম বয়সের বাবু দেখলে সে চমৎকার বলতে পারে,—"বাবু, তোমার রাঙা রাঙা বউ আসবে, বাবু তোমার গোড় লাগি, রাঙা ছেলে হবে বাবু—।"

একটু বেশি বয়স দেখলে সে বলে,—"বাবু, এই বাচ্চার জন্যে এক পয়সার মুড়ি কিনব বাবু, সারাদিন খায়নি বাবু, দুধের বাচ্চা বাবু, বাবু তুমি রাজা হবে···।" দুধের বাচ্চা আহ্লাদীর কোলে হাবার মতই চেয়ে থাকে।

বাদলার দিন। তবু প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেলেও আহ্লাদী কিছু পায়নি। টিপ্-টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। ট্রাম থেকে নেমে ব্যস্ত ভদ্রলোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছিল। নিজের

নোংরা আঁচলটা দিয়ে কোন রকমে শিশু ভাইয়ের মাথাটা ঢেকে বৃষ্টির মাঝে আহ্লাদী ছুটোছুটি করছিল, এমন সময় শশী এসে জিজ্ঞেস কল্লে, "ঘরকে যাবিনি ?"

আহ্লাদী বললে, "না, তুই যা।"

শশী কৌতূহলী হ'য়ে বললে, "কিছু পাসনি বুঝি ?"

"তোর সে খোঁজে কি দরকার ? তুই কি পেয়েছিস ?"

শশী ট্যাঁক থেকে তিনটে পয়সা বার ক'বে দেখালে। ছোঁ মেরে একটা পয়সা কেড়ে নেবাব বিফল চেষ্টা ক'রে আহ্লাদী বললে, "একটা পয়সা দে না ভাই, সেই সকাল থেকে হাবৃ কিছু খায়নি !"

হাত পাঁচেক সবে' গিয়ে শশী বললে, "আহা হা! আবদার আব কি! নিজের পয়সায় খাওয়াও না!"

লজ্জার সঙ্গে আহ্লাদী স্বীকার করলে যে, সে একটা পয়সাও পায়নি। শশী কিন্তু পয়সা না দিয়ে চলে' গেল।

সমস্ত দিনের অনাহারে বৃষ্টিতে ভিজে ক্লান্ত কাতর ছেলেটা কোলে কাঁদতে লাগল। আহ্লাদী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একটা পয়সা অন্ততঃ না পেয়ে সে আজ যাবে না।

"আহ্লাদী, ঘর যাই, আয় লো!"—কাঁকালে ছেলে নিয়ে আরেকটি হাড়গিলের মত মেয়ে এসে দাঁড়াল।

"যাব পরে।"

"ভারী বৃষ্টি নাম্‌বে এক্ষুনি, দেখছিস না কি রকম অন্ধকার ঘুটঘুট্টী হ'য়ে আস্‌ছে।"

"নামুক, তুই যা।"—ব'লে আহ্লাদী ক্রন্দনরত ভাইকে ত্রস্ত হাতে দুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত শিশু থাম্‌ল না।

আরেকবার হাড়গিলের মত মেয়েটা যেতে অনুরোধ করলে। আহ্লাদী রাজী না হওয়ায় ব'লে গেল,—"ভাতাবের জন্যে দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি? আসবে না লো, আসবে না!"

আহ্লাদী সে কথা গ্রাহ্য না ক'বে রাস্তার দিকে ছুটল ছেলেটাকে কোলে চেপে। একটি সুবেশ ভদ্রলোক তখন ট্রাম থেকে নামছিলেন। আহ্লাদী দৌড়ে গিয়ে তাঁব পায়ে হাত দিয়ে বাঁধা গৎ আওড়াতে আওড়াতে তাঁব সঙ্গে চলল। ভদ্রলোক দু' একবাব বল্লেন, "না, না হবে না কিছু।" শেষকালে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সোজা ছাতি খুলে চললেন। আহ্লাদী সঙ্গে সঙ্গে যত রকম বুলি জানত, আওড়াতে আওড়াতে চলল বহুদূব। ভদ্রলোক কেয়ার করলেন না। হাঁফিয়ে উঠে শেষে বেগে আহ্লাদী ব'লে ফেল্লে, "দূর মিন্‌ষে।"

স্তম্ভিত হ'য়ে ভদ্রলোক ফিবে দাঁড়ালেন। পাশ দিয়ে একটা পাহাবাওয়ালা যাচ্ছিল, বল্লেন, "পাকড়ো বদ্‌মাস্‌ লেড়কিকো।"

পাহারাওয়ালা ঠাট্টা ক'বে তাড়া দিল। প্রাণের ভয়ে সমস্ত দিনের অনাহাবে ছেলে-বওয়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত দেহ প্রাণপণে টেনে মেয়েটা ছুটলো এক্কেবাবে রাস্তা থেকে একটা গলির ভেতর। যতক্ষণ না হাঁফিয়ে দম বন্ধ হবার মত হ'ল ততক্ষণ তার থাম্‌তে

সাহস হ'ল না। থেমে আশ্বস্ত হ'য়ে দেখলে পেছনে পাহারা-ওয়ালা নেই। ছেলেটা দৌড়ের ঝাঁকানিতে চীৎকার ক'রে কাঁদছিল আর দুটি মাত্র তার শেখা কথা বল্‌তে চেষ্টা করছিল, "দি—দি ভূ—।"

একটা বাড়ীর নীচু রকে আহ্লাদী ছেলেটাকে নিয়ে বসে' হাঁফাতে লাগল। শুধু হাতে ফিরলে বাড়ীতে মা বিশ্বাস ক'রবে না, বল্‌বে, "সব খেয়ে এসেছিস্।" অথচ আজ আর পাবার আশা মোটেই নেই। ক্ষিদেয় কে যেন পেটের ভেতরে নাড়ী ধ'রে পাক দিচ্ছে মনে হচ্ছিল। বাড়ী গেলে তবু যাহোক খেতে পাবে জেনেও তার বাড়ী যেতে সাহস হচ্ছিল না। বৃষ্টি জোরে পড়তে আরম্ভ হ'ল, কচি বাচ্চাটা শীতে কাঁপছিল। খোলা দরজার চৌকাঠের ভেতর জলের ছাট থেকে আশ্রয় পাবার জন্য গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্কীর্ণ গলিতে একটিমাত্র কোরোসিনের আলো অন্ধকারকে ঘোলাটে ক'রে তুলেছে। বাতির কাঁচে জলের ঝাপটা লাগছিল। দুটো বাদলা পোকা বৃষ্টির মাঝে কাঁচে মাথা ঠুকছিল। হঠাৎ ভেতর থেকে মেয়ে গলায় কে বল্লে, "দুখিয়া, ভর-সন্ধ্যেবেলা বাদলার দিন—সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে আয়, ছিঁচকে চোর ঢুকবে নইলে।"

আহ্লাদী চোর ব'লে লাঞ্ছনা পাবার ভয়ে সেই বৃষ্টিতেই বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় বোধ হয় চাকরটা বলছে শুনতে পেলে, "দরজা ত বন্ধ আছে।"

তবু খানিকটা দাঁড়ান যাবে!

ভেতর থেকে আবার মেয়ে-গলায় শোনা গেল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুই আর একবাব দেখে আয়।"

আবার কে বল্‌লে, "বলছি মা, বন্ধ আছে, আমি নিজে বন্ধ ক'রে এসেছি।"

আহ্লাদী দরজায় ছায়ায় মড়ার মত নিসাড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইবে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ কবেছে। ছেলেটা ভীষণ কাঁপছে, তাব ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে। হঠাৎ অন্ধকারে ছেলেটা কেঁদে উঠল। তার মুখে হাত চাপা দিয়ে আহ্লাদী থামাতে চাইলে—হতভাগা ছেলে বোঝে না যে এই বৃষ্টিতে বেরুলে মারা পড়বে। ছেলেটা চাপা হাতের ভেতব থেকে আরও জোরে কাঁদতে আরম্ভ করলে ভয় পেয়ে। ভেতবের ভয়-কাতুবে মেয়েমানুষটি আবার বল্‌লে, "শুনছিস দুখিয়া, দরজার গোড়ায় কিসের শব্দ হচ্ছে?"

আহ্লাদী আর কিছু না শুনেই বেরিয়ে পড়ল বৃষ্টির মধ্যে। তার নিজের দাঁতে দাঁতে ঠোকা লাগছিল শীতে, তা ছেলেটার লাগবে তার আর আশ্চর্য্য কি! কচি বাচ্চাটা কাঁপতে কাঁপতে ব'লতে চেষ্টা কচ্ছিল; "ডি—ডি হা—আ—ম।"

লম্বা গলিটার কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। সে ভিজতে ভিজতে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল।। ওপরে ছাদ দেওয়া একটু রকের ওপর পথের যত লোক গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এক তিল জায়গা

নেই। তার ভেতর ঢুকতে গিয়ে একটি ভদ্রলোকের জুতো মাড়িয়ে ফেল্লে অসাবধানে। ছেলেটি চ'টে উঠে বল্লে, "এই ছুঁড়ি, নাম এখান থেকে ; দেখতে পাচ্ছিস নে জায়গা নেই।" তারপর তাকে ঠেলে নামিয়ে দিলে।

এবার আহ্লাদী কেঁদে ফেলে বল্লে, "বাবু, তোমার পায়ে পড়ি বাবু, কচি ছেলেটা নইলে মারা যাবে।" এক জনের একটু দয়া হ'ল। আহ্লাদী জায়গা পেলে! হতভাগা ছেলেটার কান্না কিন্তু আর থামে না। বিরক্ত হ'য়ে একজন বল্লে, "তোর কি আক্কেল বলতো বদমায়েস ছুঁড়ী? দুধের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে বৃষ্টিতে নিয়ে বেরিয়েছিস!"

আর একজন বল্লে, "বদমায়েস ব'লে বদমায়েস, ওই বাচ্ছাকে জলে ভিজিয়ে রোদে পুড়িয়ে রোজ ভিক্ষে করবে। পয়সার লোভে বেটী বাচ্ছাটাকে মেরে ফেলছে!"

"বেটীকে চাবকান উচিত—আহা বাচ্চাটা আধমরা হ'য়ে গেছে।"

"তুই ছুঁড়ি নিজে ভিক্ষে করবি, তা বাচ্ছাটাকে মারতে আনিস কেন?"

"আরে নইলে যে ভিক্ষে করবার জুৎ হয় না। ছেলেটাকে দেখিয়ে মায়াকান্না কাঁদবার সুবিধে যে ঢের বেশি।"

তাদের তিরস্কার ও ছেলেটির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ আরো অনেকক্ষণ চলত, কিন্তু বৃষ্টি ধরে এল সুতরাং যে যার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

আজ আর কিছু পাবাব আশা নেই। ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে ক্রন্দনবত ছেলেটাকে শ্রান্ত হাতে কোলে চেপে কাদায় পিচ্ছিল পথ দিয়ে আহ্লাদী বাড়ীব দিকে ফিরল। কাঁকাল যেন ব্যথায় ভেঙ্গে পড়তে চাইছিল। হাত দুটো অবশ হয়ে আসছিল। মোড়েব কাছে পেছনেব মোটবেব আওয়াজ শুনে চমকে ধাবে সরে আসতে গিয়ে সে পিছলে পড়ে গেল, মোটবটা কোন বকমে তাব পাশ কাটিয়ে চলে গেল, বটে কিন্তু ওধাব থেকে একটা ছ্যাক্‌বা গাড়ী রাস্তায় ছিট্‌কে পড়া ছেলেটার বুকেব উপর দিয়ে চলে গেল। রাস্তার লোক হৈ হৈ ক'বে উঠল। একটা বিষম হট্টগোল বেধে গেল। আচ্ছন্নেব মত কাদা থেকে গা ঝেড়ে উঠে আল্লাদী দেখলে ভাই-এর মুখ দিয়ে এক ঝলক বক্ত উঠেছে।

কে একজন ছেলেটাব উপব ঝুঁকে পড়ে বলছিল, "নাঃ, এক্কেবারে শেষ হয়ে গেছে!"

······লোকজনেব চেঁচামেচি, একটা সাদা পোষাক, তারপর অন্ধকার······

—দশ—

পোনের দিন আহ্লাদীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। তিনকড়ি কাজ কামাই ক'রে বিস্তর খোঁজাখুঁজি ক'রলে, কিছু খবর মিলল না। দুর্ভাগ্যক্রমে মুচিপাড়ার কেউ দুর্ঘটনার জায়গায় ছিল না। তার পরদিন কোন খবরের কাগজের এক কোণে দুর্ঘটনার খবর বেরিয়েছিল হয়ত, কিন্তু খবরের কাগজের জগৎ আর মুচিপাড়ার জগৎ বুধগ্রহ থেকে পৃথিবীর মতই পৃথক। একটা গুজব শুধু উঠেছিল, আহ্লাদী ছেলেটা সমেত চাপা পড়েছে; কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু বোঝা গেল না। কোথায় কেমন ক'রে সে খবরও পাওয়া গেল না।

পোনের দিন পরে মুচিপাড়ায় কিন্তু বেশ একটু সাড়া প'ড়ে গেল। এক সাহেব খৃষ্টান পাদরীর সঙ্গে হঠাৎ ফরসা কাপড় সেমিজ প'রে আহ্লাদী কোথা থেকে হাজির! আহ্লাদী বাড়ীতে ঢুকেই বাপ-মাকে দেখে চীৎকার ক'রে কাঁদতে সুরু ক'রে দিলে। একলা আহ্লাদীকে দেখে আহ্লাদীর মা আছড়ে মাটিতে প'ড়ে বুক চাপড়াতে আরম্ভ ক'রলে। আহ্লাদী কাঁদলে, কিন্তু মাটিতে আছড়ে প'ড়ল না। জন্মদুঃখী মেয়েটার যে ভাইয়ের শোকেও এত ভাল কাপড় জামা ময়লা করবার ক্ষমতা নেই।

তখন বাহিরে'পাদ্রী সাহেবকে ঘিরে পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার তারা আর কখনও দেখে নি। সত্যিকারের গোরা সাহেব তাদের আহ্লাদীকে নিজে

গাড়ী ক'রে বাড়ী পৌছে দিতে এসেছে, আর ভদ্রলোকের মেয়ের মত জামা কাপড় পরিয়ে!—এ যে ভাবাও যায় না। পাদ্রী সাহেব খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটির বাপ কি এখানে আছে?"

বিস্মিত লোকগুলোর ভেতর একজন সাহস ক'রে বললে, "না, সে ভেতরে আছে, ডেকে দেব?"

সাহেব বললে, "দিলে ভালো হয়।"

দু'তিনজন মিলে হতভম্ব তিনকড়িকে ডেকে আনলে। সাহেব তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ কি বলাবলি ক'রলে। তারপর গাড়ীতে চ'ড়ে চলে গেল। সাধারণতঃ তিনকড়ি মুচিপাড়ার সবার চেয়ে একটু গম্ভীর, একটু পৃথক। দশটা কথার উত্তরে সে একটা কথা কয়—তাও কাজের কথা। কৌতূহলে বুক ফেটে গেলেও প্রথমে কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলে না। তিনকড়ি ঘরে চলে যায় এমন সময় একজন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস ক'রে ফেললে, "তোমার সাছে সাহেব কি কথা কইলো গো?"

তিনকড়ি ঢুকতে ঢুকতে শুধু ব'লে গেল, "ও কিছু নয়।"

খানিকক্ষণের মধ্যে মুচিপাড়ায় রটে গেল,—তিনকড়ি সপরিবারে 'খিরিষ্টান' হ'য়ে গেছে। সাহেবেরা নাকি অনেক টাকা দিয়ে তাকে রাজী করিয়েছে; আর তারা শীগগিরই এ-বাসা ছেড়ে তাদের নতুন কোঠা বাড়ীতে উঠে যাবে।

—এগার—

রেভারেণ্ড ষ্ট্যান্‌লি ত্রিশ বছরের যুবা। ইংলণ্ডের এক সম্পন্ন লর্ড ফেমেলির ছেলে ও অক্সফোর্ডের এম-এ হ'লেও তিনি বাইশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে চিরকুমার ব্রত নিয়ে পাদ্রী হ'য়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর কলেজ-জীবনে যারা তাঁর সঙ্গে মিশত তারা কিন্তু তাঁর এই পাদ্রী হওয়ায় সব চেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছিল। পাঠ্যাবস্থায় তাঁর অন্তরের এই দিকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন আভাস তারা পায় নি। তাঁর আলাপী মহল তাই এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের মূলে একটা ব্যর্থ প্রেমের ব্যথা আছে বলে সন্দেহ করত। Oxford Eleven এর Captain, চির স্ফূর্ত্তিবাজ, সকল কাজে ওস্তাদ ষ্ট্যানলির পাদ্রী হওয়া একটু আশ্চর্য্যই বটে। কিন্তু অতল সমুদ্রের চেয়ে—যে মানুষ রহস্যময় তার অন্তরের খবর কে জানে? ছেলেবেলা থেকে ষ্ট্যানলির একটা টান ছিল যত প্রাচীন কীর্ত্তিময় ধ্বংসাবশেষ দেশের দিকে। মিশর, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ তাঁর মনে একটা অপূর্ব্ব মোহের সঞ্চার করত। মনে হ'ত ব্যস্ত ইউরোপের কারখানার জগৎ থেকে সে একটা বিভিন্ন জগৎ—স্বপ্নময় চিরগোধূলি-বেলার। রবি বাবুর কবিতা তখন ইউরোপে সবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ষ্ট্যানলি গীতাঞ্জলির অনুবাদ পড়লেন, সব বুঝতে না পারলেও মনে যেন একটা নেশা

ধ'রে আছে মনে হ'ল,—একটা অর্দ্ধ চেতনাময় মধুর নেশা। শকুন্তলার অনুবাদ পড়লেন, ভারতকে জানবার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তখন ভারত জুড়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, কিন্তু এই স্বপন-ধেয়ানী ভারত পূজারীর স্বপ্ন সে তীক্ষ্ণ চীৎকারে একটুও ভাঙল না। তারপর যখন যাজক হ'লেন তখন চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ষ্ট্যানলি ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করতে যাবার অনুমতি যোগাড় ক'রে অক্সফোর্ড মিশনের মেম্বার হ'য়ে কলকেতায় এলেন।

হায়! কল্পনার ভারতবর্ষে আর সত্যকার ভারতবর্ষে কি এত প্রভেদ হ'তে পারে? ষ্ট্যানলির সব স্বপ্ন চূরমার হ'য়ে গেল। গরীব তেমনি এখানে খেতে পায় না—স্বার্থ নিয়ে মানুষে মানুষে তেমনি কামড়া-কামড়ি এখানে, দারিদ্র্য তেমনি বীভৎস, তেমনি নিষ্ঠুর—তেমনি সীমাহীন। মজুররা তেমনি শীর্ণ বুভুক্ষু অশিক্ষিত কদর্য্য। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল ত গেলই। ষ্ট্যান্‌লির মনে হ'ল ভগবান তাঁকে বিনা উদ্দেশ্যে ভারতের দিকে আকৃষ্ট করেননি। এই দুঃখী মুমূর্ষু জাতটাকে যীশুর বাণী দিয়ে আবার সঞ্জীবিত করতে হবে, সেই বিরাট দুঃসাধ্য কাজের একজন কর্ম্মী হ'বার জন্যই ভগবান এমন ক'রে তাঁকে এখানে এনেছেন। এই জাতটা একদিন যে ধর্ম্ম সাধনায় ভগবানের খোঁজে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল সেটা জানা ষ্ট্যান্‌লির কাছে বিশেষ দরকারী মনে হ'ল না। তার দর্শনের সূক্ষ্মতা যত বেশিই হোক্ না, ও তার সাধনা যত বিরাট

ও মহানই হোক না—সে সাধনা যখন তাকে অধঃপাত থেকে বাঁচাতে পারেনি, তখন তার কোন বিশেষ মূল্য আছে ব'লে ষ্ট্যান্‌লির মনে হয়নি। ষ্ট্যান্‌লির আন্তরিক বিশ্বাস ক্রমাগতই বলতে লাগল যে ভারতে খৃষ্টের বাণীর প্রয়োজন আজ সব চেয়ে বেশি এবং তিনি সেই জন্যেই ভগবানের প্রেরিত। Oxford Mission-এর সভ্য হ'য়ে প্রথমে এ দেশে এলেও ষ্ট্যান্‌লি বেশি দিন তাদের সম্পর্ক রাখতে পারলেন না। অক্সফোর্ড মিশন ভারতের সঙ্গে কারবার ক'রে বিজ্ঞ হ'য়েছে, তারা অকারণ উত্তেজনা অতিরিক্ত আগ্রহ ইত্যাদি পছন্দ করে না। কিন্তু ষ্ট্যান্‌লিব চিরকালের স্বভাব মেতে ওঠা, না মেতে উঠে কোন কাজ করাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ষ্ট্যান্‌লির সঙ্গে মিশনেব কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধতে লাগল, তিনি তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। নিজে চেষ্টা ক'রে বিলেতে গিয়ে টাকা যোগাড় ক'রে ফিরে এসে ছোট জাতের শিশুদের জন্যে একটা পাঠশালা খুললেন, তার সঙ্গে একটা অনাথাশ্রম। ষ্ট্যান্‌লির ধারণা ছিল এই গরীব শ্রমিক ছোটলোকদেরই সব চেয়ে বেশি দরকার যীশুর সান্ত্বনার। তাদের মধ্যে পাপ প্রবল, দারিদ্র্য ভীষণ, দুঃখ অসীম—"They that be whole need not a physician, but they that are sick." আর "Come unto Me, all *ye* that labour and are heavy laden and I will give you rest."

এই ছোট জাতকে তাদের নিজের দেশের লোক পায়ে ঠেলে। তাদের প্রতি ভাগ্য বিমুখ—মানুষ বিমুখ। শয়তান তাই এই ছন্নছাড়াদের বশ করতে এত সুবিধে পায়। ভগবানের আশীষ-বাণী শোনা তাদেরই ত সব চেয়ে দরকার। জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষে ষ্ট্যান্‌লি ছোটলোকদের ভেতর মিশে তাদের মিষ্টি কথা ব'লে, দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে হতাশায় আশা দিয়ে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন। বাধা বিস্তর—তারা তাঁর এই সহৃদয়তার মূলে সর্ব্বদাই একটা কিছু মতলব আছে সন্দেহ করে—বাইরে কেউ শ্রদ্ধা দেখালেও তাঁর সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারে না, চায়ও না। কেউ সাহেবের মাথা খারাপ বলে ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে, কেউ সাহেবকে বুদ্ধি দিয়ে নিরস্ত করতে চায়, বলে,—"সাহেব এরা ছোট জাত, যতই কর, এরা নেমক-হারামী করবেই; তোমার সামনে বলবে, 'সাহেবের যীশু ভাল, আর লুকিয়ে বলবে, খুব ফাঁকি দিয়ে পয়সা আদায় করেছি'!" ষ্ট্যান্‌লি কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন। সাগরপারের এই সদাশয় ইংরাজ নিজের বংশমর্য্যাদা জাত্যাভিমান তুচ্ছ ক'রে লোকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপহাস অবজ্ঞা ক'রে বিদেশের দুঃখীদের জন্যে তাঁর অন্তরের বিশ্বাসমত নিজেকে নিয়োগ করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায়—অমনি গরীবের পাড়ায় কাজ সারবার পর বৃষ্টির জন্যে গাড়ী ভাড়া ক'রে তিনি বাড়ী ফিরছিলেন, এমন সময় ওই দুর্ঘটনা। শিশুটিকে ও জ্ঞানহীন আহ্লাদীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ

মোটর ভাড়া ক'রে তিনি মেডিকেল কলেজে গেলেন। ছেলেটা মারা গেছল। আহ্লাদীর ঘণ্টাখানেক বাদে জ্ঞান হ'ল। তাকে তিনি নিজের অনাথাশ্রমে রাখলেন ক'দিন সুস্থ করবার জন্যে।

তিনকড়ির সঙ্গে পাদ্রী সাহেবের যে গোপন আলাপ প্রতিবেশীদের এত কৌতূহল উদ্রেক ক'রেছিল তা' বিশেষ কিছু গুরুতর ব্যাপার দিয়ে নয়। পাদ্রীসাহেব শুধু আহ্লাদী আর তার ভাইকে নিজের স্কুলে পড়াতে ও নিজের জায়গায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনকড়ি রাজী হয়নি।

তারপরদিন পাদ্রী সাহেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মুচিপাড়ার বদ্ধ বিলে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। সাহেব সব ছেলেদের একখানি ক'রে চমৎকার ছবি আর বয়স্কদের একখানি ক'রে রঙ্গীন বই যেচে দিয়ে গেলেন। মুচিপাড়ার ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। ভদ্রলোকেরা কেতাব পড়ে তারা জানত। তাদের দু'একজনও অতিকষ্টে বানান ক'রে বটতলার একটা দু'টো বই পড়তে পারত বটে সময় হ'লে, কিন্তু এমন ছবি সমেত বই প্রত্যেকের ঘরে—স্বয়ং সাহেবের দিয়ে যাওয়া—তাদের কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার। কম বুদ্ধিমানেরা নীরবে বইগুলো তুলে রাখলে সম্পদের মত। বেশি বুদ্ধিমানেরা বলাবলি করলে যে সাহেবের মতলব ভাল নয়। এমনি ক'রে ভুলিয়ে সকলকে কি যে করবে সে বিষয়ে তাদের কল্পনা কিন্তু কোন সাহায্য করতে পারলে না।

দ্বিতীয় দিন আবার সাহেব যখন এসে সকলকে জিজ্ঞেস কল্লেন, তারা কিছু পড়েছে কিনা, তারা অবাক হ'য়ে গেল। একজন বললে,—"খাবার সংস্থান করতে প্রাণান্ত, পড়ব কখন সাহেব?" আরেকজন সায় দিয়ে বল্‌লে,—"পড়তে জানলে আর এমন দুর্দ্দশা হয়!"

ষ্ট্যান্‌লি বললেন,—"আচ্ছা, যে দিন তোমাদের ছুটি থাকবে, আমি নিজে এসে তোমাদের সঙ্গে পড়ব।"

তারা হো হো ক'রে হেসে উঠল, বললে—"আমাদের ছুটি মরলে।"

সাহেব উপায় না দেখে বললেন,—"আচ্ছা, তোমরা না পড়তে পারো, তোমাদের ছেলেপুলেদের আমার স্কুলে নিয়ে যেতে দাও।"

তাতে কেউ রাজী হ'ল, কেউ হ'ল না। কেউ বললে,—"খেটে খেতে হয় যাদের সাহেব, তাদের কি ও-সব বাবুয়ানী চলে? ও-সব ভদ্রলোকের ছেলেরা পারে।"

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর সাহেব গুটিকতক বাপমাকে রাজী করিয়ে খাওয়া-পরার ভার নিতে স্বীকার ক'রে ক'টি ছেলে মেয়ে নিয়ে গেলেন। আহ্লাদী তার নিজের বাড়ীর দুঃখের তুলনায় অনাথাশ্রমের সুখ-সুবিধা কত বেশি দেখে এসেছিল। সেখানকার ছেলে মেয়েরা কি রকম বড় লোকের ছেলে মেয়ের মত ফর্সা কাপড় জামা পরে—কি রকম না খেটে ভাল খায় দায়,

কি রকম আমোদ আহ্লাদ করে—সত্যিকারের পুতুল নিয়ে খেলা করে !

আহ্লাদী যাবার জন্যে কান্নাকাটি আরম্ভ ক'রে দিলে। অনেক মিনতির পর তিনকড়ি শশীকে রেখে একলা আহ্লাদীকে পাঠিয়ে দিলে। শশী তাতে বিশেষ কিছু দুঃখিত হয়েছে মনে হ'ল না। সে ত আর সে স্বাদ পায়নি ! তা' ছাড়া তার দুরন্ত মন কোনরকম বাঁধাবাঁধিকে সইতেই নারাজ।

—বার—

যারা সারাদিন নিজের পেটের ধান্দায় ব্যস্ত থেকেও আরাম ক'রে খাবার মত দুমুঠো বেশি চালের যোগাড় করতে পারে না, পরোপকার করবার প্রবৃত্তি তাদের বড় থাকে না; থাকলেও করবার ফুরসৎ তাদের নেই। সুতরাং হারু বুড়োর মৃত্যু শয্যায় বেগার খাটবার লোক মুচিপাড়ায় মেলেনি। মাঝে মাঝে কেউ দয়া করে' গালে একটু জল দিলে বুড়ো খেতে পেত, নইলে শুকিয়ে থাকত মলমূত্রে মাখা বিছানায় পড়ে। হাঁসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা তারা করেনি এমন নয়, কিন্তু হাঁসপাতালে মরতে হলেও ভাগ্য থাকা চাই, অন্ততঃ সুপারিশ চাই বড় একটা বিদঘুটে কিছু রোগের। যে শুধু বার্দ্ধক্যে অনাহারে অতিশ্রমে জীর্ণ হয়ে মরতে বসেছে তার জায়গা সেখানে নেই।

আপনার বলতে হারুর যারা ছিল তারা বহুদিন আগেই সুখের সংসার থেকে সেলাম দিয়ে বিদায় হয়েছিল; শুধু বুড়োই জীর্ণ হাড় কটা নিয়ে এত অযতনে অনাদরেও যেতে পারছিল না। যত দিন না হাত আপনা থেকে অবশ হয়ে পড়েছিল ততদিন হারু কারুর কাছে তা চিৎ করেনি। জ্যৈষ্ঠের গোড়াগুড়ি পর্য্যন্ত সে দুর্ব্বল হাতে হাফ্‌সোল লাগিয়েছে।

বেঠিক হাতের হাতুড়ি পেরেকের মাথায় না পড়ে আঙ্গুলে পড়লেও ক্ষান্ত হয় নি—ক্ষান্ত হলে যে চলে না! জোয়ান কালে সে নাকি ভারী তুষমণ ছিল; গায়ে নাকি তার অসীম ক্ষমতা ছিল। আজ সেই জোয়ানের ধ্বংশাবশেষের মৃত্যু শয্যায় একটু সাহায্য করবার জন্যে যদি সত্যি করে' বলতে হয় তবে এক অষ্টাবক্র বাঁকা বুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। একটু সময় পেলে শুধু মাজা-ভাঙ্গা বাঁকা বুড়ীই এসে তার নোংরা কাপড়-চোপড়গুলো একটু বদলে দিয়ে যেত'—হাতের কাছে এক ঘটি জল, তুটো ভাতের দানা রেখে যেত। কিন্তু বাঁকা বুড়ীকেই কে দেখে যে সে আবার অপরকে সাহায্য করবে! নিজের তুমুঠো ভাতের সংস্থান করতেই তার হাড় কালী হয়ে যেত। কোন দিন ফুরসৎ হ'ত কোন দিন হ'ত না। এমনি ক'রে হারুর অন্তিমের দিনগুলো কাটছিল। এমন সময়ে কোথা থেকে এক অচেনা সেবায়েৎ এসে হাজির হ'ল।

সাড়েছ'ফুট লম্বা এই কালাপাহাড় লোকটির আকস্মিক আবির্ভাব বেশ একটু রহস্যে ভরা। মুচিপাড়ার কেউ তাকে চেনে না। সে মুচিপাড়ায় নিজের পরিচয় দিতে ব্যস্ত বলেও মনে হ'ল না। সকাল বিকাল তুবার এসে সে হারুর কাপড় ছাড়িয়ে খাবার যোগাড় ক'রে দিয়ে যেত, আর রাত বারোটা নাগাদ একবার খোঁজ নিয়ে যেত। হারুর সে যে কেউ নয় তা পাড়ার লোকেরা হারুর কাছে জিজ্ঞাসা করেই জেনেছিল, কিন্তু

সে যে কে, সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। হারু বলত গরীবের ভগবান পাঠিয়েছেন।

মিঃ ষ্ট্যান্‌লি হারুর অসুখের খোঁজ পেয়ে একদিন তার ঘরে গেলেন। অপরিচিত লোকটি হারুর নতুন বিছানা পাতছিল। মিঃ ষ্ট্যান্‌লি অনেকক্ষণ হারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে হাসপাতালে যায় না কেন! হারু জানালে যে তাকে নেয় না। ষ্ট্যান্‌লি জিজ্ঞাসা কল্লেন, তিনি নেয়াবার বন্দোবস্ত করলে সে যেতে রাজি আছে কি না।

হারু বল্লে, "কেন থাকব না সাহেব, আর কতদিন এখানে পড়ে পড়ে সকলকে কষ্ট দেব!"

"আচ্ছা, আমি সে বন্দোবস্ত করব।"

ষ্ট্যান্‌লি উঠতে যাচ্ছিলেন—লোকটি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, এইবার বল্লে, "আপনার কষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু।"

ষ্ট্যান্‌লি আবার বসে বল্লেন, "কেন?"

"আমার সেটা ইচ্ছে নয়।"

"ওঃ তাহ'লে আমার কোন কথা নেই—তুমি কি এর কোন আত্মীয়?"

"হাঁ।"

হারু এতক্ষণ চুপ ক'রে তুজনার কথা শুনছিল, এইবার লোকটির দিকে ফিরে বললে? "কেন বাবা তুমি বাধা দাও?

তুমি ত নিজের ছেলের বাড়া করেছ, কিন্তু আর কত তোমায় কষ্ট দেব ? না বাবা, বুড়ো হয়েছি, মরতে দুঃখ নেই, হাসপাতালেই আমার ভালো।”

লোকটি শুধু ধীরে ধীরে বললে, “হাসপাতালে পাঠান সুবিধে হলে অনেক আগেই পাঠাতাম—আমায় কষ্ট দেবার ভয় নেই।” তারপর নীচু দরজা দিয়ে মাথা নীচু ক'রে বেরিয়ে গেল। ষ্ট্যান্‌লি খানিক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করলেন, “ও তোমার কে হয় হারু ?”

“কেউ না সাহেব; ও দেবতা—আমার কোন্ পুণ্যিতে জানি না আমার শেষ বেলায় মুখে জল দিতে এসেছে।”

“ওযে বললে তোমার আত্মীয় হয় ?”

“তা'ত আমিও শুনলুম। এজন্মের কেউ নয়, আর জন্মের হয়ত হবে।”

ষ্ট্যান্‌লির ইচ্ছা হল বলেন, “আর-জন্ম কি আছে পাগল। কিন্তু বৃথা জেনে চুপ করে' রইলেন। ওঠবার সময় বলে গেলেন, “হাসপাতালে তোমার কিন্তু কিছু কষ্ট হ'ত না।”

সন্ধ্যা হয়ে গেছল। সাহেবের আর এক জায়গায় জরুরী কাজ ছিল। মোড়ে এসে একটা গাড়ী ভাড়া করলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছুলে গাড়োয়ানকে একটা টাকা দিয়ে নেমে যাচ্ছিলেন, গাড়োয়ান পিছু ডাকলে। ষ্ট্যান্‌লি ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, “কেন, আমি তোমায় চার আনা বেশি দিয়েছি ত।” গাড়োয়ান হেসে বললে, “হ্যাঁ সাহেব, তাই ত ফিরিয়ে দিতে ডাকলুম।”

ষ্ট্যান্‌লি বল্‌লেন, “না না, ও আমি তোমায় বকশিষ দিলুম।”

গাড়োয়ান আবার হেসে বললে, “তুমি ত দিতে পারলে, কিন্তু আমি নিতে পারলুম না যে।”—বলে একটা সিকি সাহেবের হাতে ফিরিয়ে দিলে।

সামনের গ্যাসের আলো গাড়োয়ানের মুখের উপর পড়েছিল এইবার। ষ্ট্যান্‌লি চমকে বললেন, “একি তুমি! তোমাকেই না এই মাত্র হারুবুড়োর ওখানে দেখলাম?”

“হ্যাঁ সাহেব, গাড়ীও হাঁকিয়ে থাকি।”

ষ্ট্যান্‌লি কিছুক্ষণ কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?”

লোকটি একটু হেসে বললে, “আমার নাম অশান্ত কর্ম্মকার।”

—তের—

সতেরো বছরের ছেলে যখন বাংলার কোন একটা বিখ্যাত কলেজে ভর্ত্তি হতে গেছল, তখন প্রিন্সিপাল কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবেদন পত্রে পিতার নাম লেখা হয়নি কেন? সতেরো বছরের ছেলের উত্তরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি স্তম্ভিত হয়ে বলেছিলেন কোনমতে, "আচ্ছা, কাল এস।"

সতেরো বছরের ছেলে বলেছিল, "সারাজীবনে যা সঠিক জানতে পারিনি তা কোথা থেকে লিখব?" আর যাবার সময় বলে গেছল, "ভয় নেই, কাল আর আসব না। কিন্তু একটা কল্পিত নাম পেলে আপনার বিবেকের এতটা ধ্বকার হ'ত না বোধ হয়?"

তার পর সমস্ত পাঠ্য-জীবন ধরে বন্ধুদের শত অনুরোধে বিজ্ঞদের শত উপদেশেও সে কোন দিন এ কথাটা গোপন করতে চায়নি যে তার পিতার ঠিক নেই। বন্ধুরা বলত, গোপন না কর, সে কথাটা জোর করে' প্রচার করবার দরকার ত কিছু নেই। কিন্তু অশান্তর ওই ছিল ধরণ, সে বলত, "সত্য কথাটা শুনতে সমাজের এত লজ্জা এত বুকব্যথা করে কেন, গায়ের ঘা আর কতদিন এমন করে' ঢাকা রাখবে!"



তারপর যখন সে অক্সফোর্ডের এম-এ ডিগ্রী পেয়ে ইকনমিক্সে প্রথম স্থান নিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকেই লেক্‌চারারের পদ গ্রহণ করবার নিমন্ত্রণ পেলে তখন কেউ ভাবেনি যে সে অমন করে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে' চলে আসবে। কেউ ঠিক করলে, নিজের দেশের ছেলেদের ছেড়ে পরের দেশের ছেলেকে পড়াতে রাজী নয় বলেই বোধ হয় সে প্রত্যাখ্যান করেছে। আধুনিক য়ুরোপের প্রখ্যাত রাজনীতিক মনীষীদের সাথে তার তর্ক-বিতর্কের বহর থেকেই দেশ তার শক্তির কিছু নমুনা পেয়েছিল। তার গত জীবনে যত জঞ্জালই থাক দেশ তাকে উপেক্ষা করতে পারে না এমন সময়ে। যে বিখ্যাত কলেজের প্রিন্সিপালকে একদিন সে স্তম্ভিত নির্ব্বাক করে দিয়ে এসেছিল, সেই কলেজ থেকেই তাকে সাদরে আহ্বান করে পাঠালে। তার উত্তর অশান্ত কর্ম্মকার যা দিলে তা অদ্ভুত।

*

অশান্ত লিখলে, "গরুর চেয়ে ঘোড়া চালানটাই বেশী পছন্দ হ'ল। একটা ঘোড়ার গাড়ী কিনে ফেলেছি—মার্জ্জনা করবেন।"

অবশ্য ছাত্ররা যে সব গরু এমন ধারণা অশান্তর ছিল না, কিন্তু খোঁচা দিতে পারলে অশান্ত কিছুতেই ছাড়তে

পারত না। চেষ্টা করেও সে নিজের মনের এই আঘাত করবার দুরন্ত জ্বালাময় প্রবৃত্তি দমন করতে পারত না। তার মুখ থেকে বা কলম থেকে একটু বিষ না নিয়ে কোন কথা বেরুতে চাইত না।

সেবার মস্ত এক স্বদেশী সভায় তাকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। দু'একজন বক্তা দেশ সম্বন্ধে নানা মর্ম্মস্পর্শী কথা বলবার পরে অশান্ত যখন উঠেছিল তখনকার হাততালির বহর দেখে কেউ ভাবেনি খানিক বাদেই সে-হাততালির অমন পরিণাম হবে।

অশান্ত কর্ম্মকার বলেছিল, "আমি এ পর্য্যন্ত যা শুনলুম তাতে মনে হয় আমি যা বলব তা সকলের মুখরোচক হবে না। আপনাদের সভার কার্য্যকলাপ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে এই সভা করা ও স্বদেশী রক্তৃতা দেওয়া আপনাদের থিয়েটার যাত্রা গান ইত্যাদির মত একটা নূতন থবণের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়।"

সমবেত লোকেরা তঁখনও রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিল, তারা থ' হয়ে গিয়েছিল। অশান্ত আরো বললে, "এখানে যাঁরা দেশ দেশ বলে চীৎকার করছেন ও কববেন তাঁরা যে দেশের 'দ'র জন্যেও কেয়ার করেন না এবং দেশ সম্বন্ধে তাঁদের দুর্ভাবনা যে কতটুকু তা আমি ভাল রকমই জানি। তা ছাড়া তাঁদের চিন্তা করবারই ক্ষমতা নেই।"

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "আপনি বসে পড়ুন।"

অশান্ত বলে যেতে লাগল, "তাঁরা মুখস্ত বুলি আউড়ে চলেছেন—দেশ উদ্ধার কর, দেশের উন্নতি কর, স্বরাজ দাবী কর, ··· ··· দেশের সত্যিকারের উন্নতি করতে গেলে আগে দরকার পরসাহায্যপুষ্ট অকর্ম্মণ্য পরগাছাদের সমূলে উচ্ছেদ। কিন্তু সে কথা বলবার সাহস ত দূরের কথা, ভাববার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। তা ছাড়া কোথায় দেশ? আমি'ত পৃথিবীতে আজ দেখছি দেশ নেই, জাতি নেই,—শুধু আছে দুটো বিরাট দল, একটা হচ্ছে যারা অবিচার অন্যায় করে, আর একটা যারা পৃথিবী জুড়ে এই পরগাছাদের রসদ যোগায় আপনাদের কল্‌জের রক্ত দিয়ে। আমার কাছে দেশ নেই, স্বদেশীর হুজুক বুজরুকি···" —চার দিকে রব উঠল, "Shame! Shame!", "বসিয়ে দাও," "দূর করে' দাও"। অশান্ত বলে যেতে লাগল, "এই সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া বড় মানুষের বাজে বিলাস। আমি দেখছি উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক, অবিচারী আর যারা অবিচার সয়, এই দুটো দল। এই দুটো দলের মৌখিক সংযোগ থাক আর না থাক নাড়ীর সংযোগ আছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই এক দলকে পায়ের তলে রেখে তাদের রক্ত শুষে নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র চলেছে আরেক দলের—কম আর বেশী—"

সভায় গোলমাল অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছিল। একজন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "পাগলের প্রলাপ শুনতে আসিনি মশাই।"

সভাপতি একটা কাগজে লিখে পাঠালেন, "আপনার কথা শুনতে অনেকে চাচ্ছে না ; আপনি বসলে বোধ হয় ভাল হয়।"

অশান্ত কাগজটা পড়ে' ছিঁড়ে ফেলে বলে যেতে লাগল, "দেশ দেশ করে' চেঁচালে দেশের উন্নতি হয় না। আর যদি বা দেশ এই চিৎকারেই হঠাৎ স্বাধীন হয়ে পড়ে তাতে কি লাভ? মজুরের মুখের ভাতে পুষ্টির উপকরণ কতটুকু বাড়বে? চাষার ভাঙ্গা চালায় কটা ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির জল আর শীতের হাওয়া আসা নিবারণ হবে? কুলির কদর্য্য, নোংরা, মানুষের বাস করবার অযোগ্য বস্তির কতটুকু শ্রী ফিরবে? আজকের এই উপবাসী অতিশ্রমক্লিষ্ট জীর্ণদেহ ভগ্নস্বাস্থ্য উৎপীড়িতদের অন্ধকার জীবনে কতটুকু আলো আসবে! নোংরা ছোট লোককে ঝেঁটিয়ে দূর করে' দিয়ে তেমনি অক্ষম ধনীর প্রাসাদ উঠবে তাদের জীর্ণ কুঁড়েকে ব্যঙ্গ করে'। তেমনি চলবে দেশ জুড়ে অত্যাচারিতের মুমূর্ষু বুকের ওপর প্রবলের বিলাসনৃত্য! কি মূল্য স্বাধীনতার? আগে এই বিশ্বজোড়া অন্যায়ের এই অবিচারের......"—সভায় কোলাহল এত বেড়ে উঠল যে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব। সভাপতি নিজে উঠে অশান্ত কর্ম্মকারকে বসতে অনুরোধ করলেন।

সেদিন সভা থেকে বেরিয়ে আসবার পর অশান্ত কর্ম্মকার আর কোন স্বদেশী সভায় যায় নি। কিন্তু তার মত প্রচার করতে একদিনও সে পেছপাও হয়নি।

বন্ধুদের কাছে সে বলত, "কোথায় গলদ তা আমি বেশ

বুঝি, কিন্তু পথ যে কোন্ দিকে তা আজও ভাল করে' ঠিক করতে পারলুম না। যুগ যুগান্তরের অবহেলায় এই অন্যায় আজ তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা নিয়ে এত বিপুল হয়ে পড়েছে ও তার সঙ্গে আমাদের আজকের জীবনের সমস্ত ভালো মন্দ জড়িয়ে এমন একাকার হয়ে গেছে যে তাকে সমূলে উৎপাটন করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি হয়ত নিষ্ফল। রোগ আমাদের সমাজ দেহে এমন করে' ছড়িয়ে গেছে যে রোগের প্রতিকার করতে গেলে রোগীর ও বুঝি প্রাণ যায়। সত্যি-ই এ সমস্যার না সমাধান করলে সমস্ত মানুষ জাতটাই হয় তো লোপ পেয়ে যাবে।"

বন্ধুরা শুনে হাসলে বলত, "ওই কুলিদের নোংরা বস্তির ভেতর যে দুর্নীতির, যে ব্যাধির, যে পাপের বীজ বাড়ছে তার সমাপ্তি কি ওই কুলিদের মধ্যেই হবে ভেবেছ? কখ্খন না। ওই পচা বদ্ধ জলে যে বিষকে বাড়বার প্রশ্রয় সমাজ আজ দিচ্ছে তারই জ্বালায় ক্রমশঃ সমস্ত সমাজ উচ্ছন্ন যাবে। যে-অনুপাতে ছোটলোকে আর বড়লোকে প্রভেদ বাড়ছে শুধু সেই অনুপাতেই কিছুদিন বাড়লেই ত সমাজের এক অংশ মরবে অতিরিক্ত আয়েসে জীবনী শক্তিতে ভাঁটা পড়ে, আর এক অংশ মরবে অতিরিক্ত দুঃখ দুর্দ্দশার গুরুভারে। এক এক সময় হতাশ হয়ে ভাবি সত্যিই বুঝি এ সমস্যার কোন দিন সমাধান হবে না।"

—চোদ্দ—

বর্ষায় সমস্ত মুচিপাড়াটার জলে কাদায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে এক পা-ও কাদায় না পড়ে যাবার উপায় ছিল না। অধিকাংশ ঘরের ভেতরকার অবস্থা বাইরের চেয়ে বিশেষ ভাল ছিল না। সমস্ত মাটির মেঝে ফুঁড়ে জল ওঠার দরুণ ঘরের মধ্যে শোওয়া বসা অসম্ভব হলেও উপায় তা ছাড়া নেই। পুকুরের পাশেই যাদের ঘর, বৃষ্টির জলে পুকুর ভরে উঠে তাদের বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত চড়াও হয়েছে। চারিদিকে পচা গাছপালার একটা দুর্গন্ধ, বাতাস ভারী করে' তুলেছিল। তারি মাঝে উলঙ্গ গুটিকতক ছেলে মেয়ে ময়লা দেহে কাদায় গড়াগড়ি করে' খেলা করছিল।

কালাচাঁদ ঘরের ভেতর থেকে বললে, "আজ আর রাঁধবি কি করে, বাইরে ওই জলের ওপর ?"

পাঁচি ভিজে কাঠের অজস্র ধোঁয়ায় অস্থির হয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে,—'উনুনইত ধরল না।"

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল ; কালাচাঁদের ঘরের চাল ফুঁড়ে তার ঝাপটাও মাঝে মাঝে ভেতরে আসছিল। "বৃষ্টি ত আর থামছে না। আজ আর তবে রেঁধে কাজ নেই।

"খাবে কি তা হলে ?"

"দুটো মুড়ি আর তেলে ভাজা নিয়ে আসি না হয়।"

ভিজে কাঠকে কোন রকমে দুরস্ত করতে না পেরে পাঁচি বললে, "তাই যাও, এ উনুন আর ধরবে না। ঘরে কি একটা জায়গা শুক্‌নো আছে যে কাঠ রাখব!"

কালাচাঁদ বেরিয়ে এসে বললে, "দে তবে ছ'টা পয়সা।"

পাঁচি তিনটে পয়সা একটা ভাঙা বিস্কুটের টিন থেকে বার করে' দাদার হাতে দিয়ে বলে, "ওই তিন পয়সা হলেই হবে।"

"তিন পয়সায় দু'জনের কি হবে রে?"

"আমার ত কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছে, এ বেলা উপোস দেব।"

পাড়ায় কদিন থেকে একটা বিশ্রী জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। চার পাঁচজন এর মধ্যেই মারা গেছল।

কালাচাঁদ ভীত হয়ে বলে, "এতক্ষণ বলিস নি কেন? ওই জ্বরের ওপর আবার তুই জলে ভিজে রাঁধতে গেছলি?"

"তা কি হবে?"

"তা কি হবে? গগনের মেয়েটা অমনি করে' জ্বরের ওপর জলে ভিজেই ত মারা গেল। কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল ত সমস্ত রাত এই ভিজে মেঝেয় পড়ে' ছিলি কেন?"

পাঁচি কোন উত্তর দিলে না।

"যা খুশি কর বাপু—ভাল লাগে না আর আমার"—বলে' কালাচাঁদ বেরিয়ে গেল।

পাঁচি সমস্ত বুকে পিঠে অসহ্য বেদনা অনুভব করছিল। মাথাটা ভার হয়ে চোখ দিয়ে যেন তার আগুন বেরুচ্ছে। সে গিয়ে কালাচাঁদের ঘরে একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। গত দু' তিন দিন তার চোখের ওপরই এই রকম জ্বর হয়ে দেখতে দেখতে কজন মারা গেছে। সুতরাং মরণের সম্ভাবনা তার মনকে একেবারে বিচলিত করে নি এমন নয়, কিন্তু তার চিরবঞ্চিত আশাহীন জীবনে মৃত্যুর কাছ থেকে আর ভয় করবার কি ছিল?

কালাচাঁদ কোঁচড়ে করে' মুড়ি ও তেলে ভাজা এনে, মুখ ভার করে' রান্নাঘরের চৌকাটে বসে' খানিক সেগুলো নীরবে চিবিয়ে হঠাৎ আপন মনে গুমরাতে আরম্ভ করলে।

"পারব না আমি রোজ রোজ এই নিউড়োনা মুড়ি চিবুতে—কেন, আমি কি রোজগার করে' আনি না?"......

পাঁচি জ্বরের যন্ত্রণার মাঝে দাদার এই অন্যায় কথাবার্ত্তায় যোগ দিল না।

কালাচাঁদ আবার আরম্ভ করলে—"কেন, আমি মুড়ি খেতে যাব, ভাত রাঁধবার লোক কি আমি রাখতে পারি না?...এই যে এখন তোর জ্বর হল জলে ভিজে ভিজে, এখন তোকেই বা কে দেখে আর আমাকেই বা কে দেখে! মুড়ি খেয়ে মানুষ থাকতে পারে রোজ রোজ!"

এবার পাঁচি আর কথা না কয়ে পারলে না।

"কদিন তোমায় মুড়ি খেয়ে থাকতে হয়েছে দাদা? আজ ত

এই জ্বর নিয়েও রাঁধতে গেছলাম, ভিজে কাঠ ধরল না—সে আমার দোষ...”

কালাচাঁদ বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—“কেন তুই জ্বরের ওপর জলে ভিজে রাঁধতে গেছলি! এ ত আর কিছু নয় শুধু আমাকে জব্দ করার মতলব। এখন আমি গরীব মানুষ ডাক্তার বদ্যির খোরাক যোগাতে হায়রান হই, তাই ত তুই মজা করে' দেখতে চাস?”

“আমার জন্যে তোমার বদ্যি আনতে হবে না দাদা, আমি অমনিই মরতে পারব।”

কালাচাঁদ চটে উঠে বললে,—“না বদ্যি আনতে হবে কেন? জলে ভিজে ইচ্ছে করে' জ্বর এনেছিস, এখন বদ্যি আনতে মানা করবি বইকি? নইলে মরে আমার সর্ব্বনাশ করবি কি করে'!

দাদার এই অনর্থক কুঁদুলেপনায় বিস্মিত হয়ে পাঁচি বললে,—“এ ত ভারী মুস্কিল দেখছি, রাঁধতে পারিনি বলে' মুড়ি খেতে হচ্ছে, তাই নিয়ে একবার বকাবকি করলে, আবার এখন বলছ কেন রাঁধতে গেছলাম! কি করলে ভাল হ'ত তাত বুঝলাম না...”

“কি করলে ভাল হ'ত তা আর কতবার করে বলব!”

কালাচাঁদ ভুক্তাবশিষ্ট মুড়ি একটা পাত্রে রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর কাজে বেরুবার জন্যে গামছাটা কাঁধে ফেলে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে আবার কি মনে করে' পেছন ফিরে বললে, “আমার কথা

রাখলে আজ তোকে জ্বর নিয়ে রাঁধতে যেতে হয়, না, আমায় শুক্‌নো মুড়ি চিবিয়ে কাজে বেরুতে হয়!"

তারপর আর-একটু এগিয়ে পাঁচির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধেক মিনতি ও অর্দ্ধেক রাগের স্বরে বললে—

"একটা লোক নিজে থেকে সংসারে আসতে চাইছে, তাতে সংসারের আয় বাড়বে, তোর কাজের ঝঞ্ঝাট কমবে, তাতে তোর আপত্তি কেন শুনি ?"

এতক্ষণে দাদার কুঁহুলেপনার অর্থ বুঝতে পেরে পাঁচি বৃথা বাক্যব্যয় বন্ধ করে' কাঁথাটা ভাল করে' গায়ে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শু'ল।

কালাচাঁদ খানিক দরজাটা ধরে উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট দুই-তিন বাদেও কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—"তুই কি একটা কথার উত্তর দেওয়াও জ্বালা মনে করিস পাঁচি ?"

জ্বরের যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়ছিল। পাঁচি মুখটা কালাচাঁদের দিকে ফিরিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বলে, "ও-কথার উত্তর ত অনেক বারই দিয়েছি দাদা। ও কি জাত তার ঠিক নেই, পঁচিশ বছরের একটা মাগীকে ঘরে আনবার কথা বার বার বলতে তেমোর লজ্জা হয় না দাদা! আমাদের বংশে কখন অমন অনাচার হয়েছে ? নফর তার মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে, তুমি রাজী হও, আমি এক মাসের মধ্যে পিরতিমের মত বৌ ঘরে আনছি—"

"ওঃ—তাহ'লে ত আর সোয়াস্তির শেষ থাকে না! আমাদের কে দেখে তার ঠিক নেই আবার একটা কচি বাচ্ছাকে মানুষ কর!'

"সে মানুষ ত আর তোমায় করতে হবে না দাদা, আমি করব।"

"তাই'লেই সব ঝঞ্ঝাট কমে যাবে! তোর অসুখ করলে আরো ভালো করে' সংসার চলবে! আমি ও-সব বাজে কথা আর শুনতে চাই না, কালই আমি নেত্যকে নিয়ে আসব, দেখি তুই কি করতে পারিস!"

তার হৃদয়ের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও সংস্কারের এই বিরুদ্ধাচরণে একান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পাঁচি আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু বললে "আমি কাল থেকে জীবনের মার কাছে গিয়ে থাকব দাদা।"

যে সংস্কারের জোরে সে তার ব্যর্থ যৌবনের সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা ও সমস্ত কামনাকে অস্বীকার করে' আপনাকে নির্ম্মম-ভাবে বঞ্চনা করেছে, যে সংস্কারের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা তার নিরর্থক জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা ও কৈফিয়ৎ—সে সংস্কারের অসম্মান সে যে কিছুতেই সইতে পারে না।

খানিক চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে "তোর যে চুলোয় ইচ্ছে যাস"—বলে' কালাচাঁদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদেই অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হেঁকে বলে' গেল, "আজ কিন্তু যদি বাড়ী থেকে এক পা বাড়াস ত আমার মরা মুখ দেখিস।"

—পনের—

এবার বর্ষায় মুচিপাড়া ও তার পাশের মেথর বস্তির অশোভন ও বোধ হয় অনাবশ্যক জনসংখ্যা-সমস্যার মীমাংসা করবার ভার নিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা ও তারই নিকট ও দূর সম্পর্কীয় কয়েকজন জ্ঞাতি-গোত্র। সে ভার-নির্ব্বাহে তাদের আলস্য ছিল না।

ষ্ট্যান্‌লি সাধ্যমত সন্ধান নিয়ে ঔষধ বিতরণ ও পরিচর্য্যা করে গভীর রাত্রে মুচিপাড়া ও মেথর বস্তির মাঝের কর্দ্দমাক্ত একটা গলি দিয়ে ফিরছিলেন। নামে পথ হ'লেও সেটা দুই সার বস্তির মধ্যে খানিকটা অপরিসর কর্দ্দম-ভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধকারে সামনে এক রকম হাতড়েই চলতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাদা থেকে পা টেনে তুলতে রীতিমত লড়াই করতে হয়।

খানিকদূর যাবার পর হঠাৎ অন্ধকারে কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ষ্ট্যান্‌লি দাঁড়িয়ে পড়লেন। অপর লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়লো। গাঢ় অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না, তবু মনে হ'ল যেন লোকটির কাঁধে কি একটা বিশেষ ভার আছে। এই পথেরই মত ডানদিকের আর একটি পথ দিয়ে লোকটি এসেছে বোঝা গেল; কিন্তু তার কাঁধের বোঝাটি যে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে ষ্ট্যান্‌লির কল্পনা তাঁকে কিছু সাহায্য করতে পারল না। এত রাত্রে

এই অন্ধকার গলিতে এ-রকম ধরণের রহস্যময় বোঝা তাঁকে একটু কৌতূহলীই করে' তুললে।

কিন্তু প্রশ্ন করবার আগেই লোকটি আবার চল্‌তে সুরু কর্‌লে, তার দ্রুতগতির অনুসরণ করা একটু কষ্টকর হলেও ষ্ট্যান্‌লি তার পিছু পিছু চল্‌লেন।

খানিকদূর এমনি করে' যাবার পর ষ্ট্যান্‌লির মনে হ'ল এ অনুসরণ তাঁর বৃথা, এ কৌতূহল তাঁর অন্যায়। পাহারাওয়ালা হ'বার সময় ও শক্তি তাঁর নেই, সুতরাং অদ্ভুত লোকটির ওই বোঝার সঙ্গে যে রহস্যই জড়িত থাক না, তার উদ্‌ঘাটন চেষ্টায় নিজের অযথা কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হবে না। কিন্তু ষ্ট্যান্‌লি তাঁর দ্রুতগতি মন্দ করতে না করতেই সাম্‌নের লোকটি তার দ্রুতগতি না কমিয়ে ও মুখ না ফিরিয়েই তাঁকে থাম্‌তে নিষেধ কর্‌লে।

"থাম্‌বেন না সাহেব, একটু দরকার আছে।"

কর্দ্দমাক্ত গলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সাম্‌নেই বড় রাস্তার গ্যাসের আলো দেখা যাচ্ছিল। লোকটি গ্যাসের আলোর সাম্‌নে কাঁধের বোঝাটি নামিয়ে রেখে ষ্ট্যান্‌লির দিকে ফিরে বললে—"আপনি একটু পরীক্ষা করে' দেখুন ত', আমার ত' মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছে।"

ষ্ট্যান্‌লি নীচের দিকে চেয়ে একবার অনিচ্ছায় শিউরে উঠ্‌লেন। এই বোঝা নিয়েই কিছুক্ষণ আগে যে সন্দেহ

করেছিলেন, তার জন্যে একটু লজ্জিতও না হয়ে পারলেন না। নত হয়ে খানিকক্ষণ নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন, "ঘণ্টা তিনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।"

সাম্‌নে রক্ত ও কর্দ্দমে মাখামাখি হয়ে যে মৃতদেহটি পড়েছিল, তার দিকে চাইলে প্রথমেই এই কথাটি মনে হয় যে দেবতা ও মানুষ মিলে আজীবন তাকে কোন লাঞ্ছনা, অপমান ও আঘাত থেকেই অব্যাহতি দেয় নি। যার বেদনাময় বার্দ্ধক্য এমন অগৌরবে সমাপ্ত হ'ল নিঃসঙ্গ মৃত্যুতে, তাব যৌবন ও শৈশব গেছে কি নিদারুণ নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা ও হতাশা নিয়ে—এই মৃত বৃদ্ধার অষ্টাবক্র কুৎসিত দেহের পানে চেয়ে ষ্ট্যান্‌লি বোধ হয় সেই কথাই ভাবছিলেন। পাশের লোকটির আহ্বানে তাঁর চমক ভাঙল।

"এখন এর সৎকার ত করতে হবে? আপনার একটু সাহায্য পাব কি?"

ষ্ট্যান্‌লি একটু বিস্মিত হয়ে তাব দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আমার সাহায্য নিতে তোমার কোন আপত্তি নেই?"

লোকটি একটু হেসে বললে, "না সাহেব, আপনার সাহায্য করতে কোন আপত্তি আছে কি?"

একটু ভেবে ষ্ট্যান্‌লি বল্‌লেন, "আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এর আত্মীয় স্বজনের খোঁজ করাতো আগে দরকার, তারা আপত্তি করতে পারে।"

"আমি একে চিনি সাহেব, এর কেউ নেই। আজ ঘটনাক্রমে

পথের কাদায় আমার পায়ে না ঠেকলে যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে' মৃত্যু হয়েছিল, সেখানেই ঐ শব ক'দিন পচ্‌ত বলা যায় না।"

"এ তো হিন্দু?"

লোকটি এতক্ষণ মৃতদেহের কাদা ও রক্ত কাপড় দিয়ে মুছছিল। দাঁড়িয়ে উঠে ষ্ট্যান্‌লির দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বল্‌লে, "গরীব।"

"হিন্দু ত?"

"গরীবের নিজস্ব কোন্ ধর্ম্ম আছে সাহেব, কোন জাতিপরিচয়? তাকে কেউ হিন্দু বলে অভ্যাসে, কেউ তাকে খৃষ্টান করে খেয়ালে, সেও নিজেকে তাই বলে' জানে, কিন্তু সে কথা যাক্ সাহেব, আপনার কোন আপত্তি নেই ত, তাহলেই হ'ল।"

"আমায় শ্মশানে যেতে হবে কি?"

"হ্যাঁ সাহেব, ভারতবাসীর মৃতদেহে তুমি বোধ হয় তোমাদের জাতের মধ্যে প্রথম কাঁধ দিলে···।"

ষ্ট্যান্‌লি একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের শ্মশানে আমার যেতে কোন বাধা নেইত?"

আগে মত দিলেও ষ্ট্যান্‌লির মনে সংস্কারগত দ্বিধা একটু জাগ্‌ছিল, বিশেষতঃ যাজকের পোষাকে এ-রকম শব বয়ে' নিয়ে যাওয়াটা একটু অশোভন হবে বলে' মনে হচ্ছিল।

লোকটি ষ্ট্যান্‌লির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, "এত রাত্রে কেউ লক্ষ্য করবে না সাহেব।"—তারপর খানিক এগিয়ে আবার

বললে, "এদের আত্মা কি আলগোছে উদ্ধার করতে চান্ সাহেব?"

ষ্ট্যান্‌লি মাথা নত করে' ছিলেন, উত্তর দিলেন না।

* * * *

ভোর হবার আগেই সৎকার শেষ হয়ে গেল। ঐ জীর্ণ দেহটুকু ছাই করতে আর অগ্নির কতটুকু সময় লাগে? ষ্ট্যান্‌লি গৃহের দিকে ফিরলেন। লোকটিকেও সঙ্গে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার গাড়ীর আড্ডায় চল্‌লে নাকি?"

"সাহেব তাহলে আমাকে ভোলেন নি?"

ষ্ট্যান্‌লি শুধু 'না' বলে' এগিয়ে চললেন।

লোকটি সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে বল্লে, "এখন গাড়ীর আড্ডায় আর যাব না সাহেব, আপনার সঙ্গে দুটো কথা কইতে চাই—"

ষ্ট্যান্‌লি দাঁড়িয়ে পড়ে' জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কথা?"

"চলুন, যেতে যেতে বল্‌ছি।"

দুজনে এগিয়ে চললেন, কিন্তু লোকটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই বল্লে না। ষ্ট্যান্‌লি মনে মনে একটু অধীর হয়ে উঠ্‌ছিলেন এমন সময় লোকটি আরম্ভ করলে—"আপনার মনে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার নেই সাহেব—আপনার মত ও কাজের অনুমোদন না করলেও যে হৃদয়ের প্রেরণাতে আপনি এখানে কাজে নেমেছেন সে হৃদয়কে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু—"

লোকটি আবার চুপ করল। ষ্ট্যান্‌লি খানিক অপেক্ষা করে' জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু কি ?"

লোকটি হাত দিয়ে সামনে থেকে অদৃশ্য কোন বস্তু যেন সরিয়ে দিয়ে বললে,—"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সাহেব, ওই বাঁকাবুড়ির শব আজ এই শ্মশানে না পুড়ে যদি গোরস্থানে যেত তাহলে এর মৃত্যু কিছু বেশী গৌরবের হোতো কি ?"

ষ্ট্যান্‌লি কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে লোকটি বল্‌তে লাগল, "ছেঁড়া নোংরা ধুতির বদলে ছেঁড়া নোংরা প্যাণ্টালুন পরালে এদের দুঃখ কতটুকু কমবে সাহেব, এদের জীবনব্যাপী দুর্দ্দশা কি ঘুচবে একটুও ? না সাহেব, ধর্ম্ম নিয়ে আমি তর্ক করছি না। খৃষ্ট ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কিনা তা নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করতে চাই না—শুধু বলতে চাই যে এখানে হিন্দুধর্ম্ম-খৃষ্টধর্ম্মের কথা আসে না, এখানে হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম মানে ছেঁড়া ধুতি আর ছেঁড়া প্যাণ্টালুন, শ্মশান আর কবর, এর বেশী কিছু নয়। আর ছেঁড়া ধুতির চেয়ে বোধ হয় ছেঁড়া প্যাণ্টালুন সস্তা ও সুবিধার নয় ! গোর চিতার চেয়ে বেশী আরামের নয় ! মানুষেরই ধর্ম্ম থাকে, এরা মানুষ হোতে পেল কবে ?"

ষ্ট্যান্‌লি মাথা নত করে' বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে' নীরবে হাঁট্‌ছিলেন, কোন কথা বল্‌লেন না।

লোকটি আবার আরম্ভ করল,—"যদি পৃথিবীর খৃষ্টানদের সংখ্যার শূন্য বাড়ানই আপনার অভিপ্রায় হয় তাহ'লে আমার

কিছু বলবার নেই সাহেব, কিন্তু যদি জীবনের এই অপমান—এই কুৎসিৎ দৈন্য, এই বীভৎস বিকার আপনাকে সত্যি পীড়িত করে' থাকে, যদি সত্যি-ই এদের কল্যাণ-ই আপনার লক্ষ্য হয়, তাহ'লে একথাগুলো একটু ভেবে দেখবেন।"

অন্ধকার প্রায় কেটে গেছল। দুজনে নীরবে নির্জ্জন পথ দিয়ে চলতে লাগলেন।

ষ্ট্যান্‌লি হঠাৎ লোকটির দিকে ফিরে বললেন, "আপনার সঙ্গে এই সব কথা আলোচনা করবার এখন বিশেষ সুবিধা হবে না, আপনি যদি আপনার ঠিকানা দেন, আমি একদিন দেখা করতে যেতে পারি।"

লোকটি হেসে বললে, "আমার কোন ঠিকানা নেই সাহেব, আমিই একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করব গিয়ে।"

—ষোল—

ছেঁড়া গামছাটা মাথায় দিয়ে কালাচাঁদ যখন কাজের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন হাজিরার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যে কন্ট্রাক্টারের অধীনে তার কাজ, তাঁর কড়া নিয়ম সে ভাল-রকমই জান্‌ত, তাই পথে মুষলধারে বৃষ্টি নামলেও সে কোথায়ও দাঁড়াতে সাহস করেনি। তবু সময় মত হাজিরা দেওয়া হ'ল না।

নুলো সর্দ্দার সামাদ হাঁক্‌লে, "একশ' তের নম্বর কালাচাঁদ মিস্ত্রী, পোনেরো মিনিট লেট।"

পথে কোথাও না দাঁড়ালেও লেট হওয়ার তার কারণ ছিল। নিজের অজ্ঞাতে সে সমস্ত পথ যে গতিতে এসেছে তা তার স্বাভাবিক গতি নয়—সে গতিতে চার মাইল পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে' সময় মত হাজিরা দেওয়া চলে না। যন্ত্রের মত সমস্ত পথ পা চালিয়ে এলেও কাজের কথা তার মনে ছিল না।

এতদিন তার আশা ছিল, পাঁচি হয়ত কোন-না-কোন দিন মত দেবেই। এখন কিছুদিন আপত্তি করলেও চিরকাল এমন করে' তার অনুরোধ ঠেল্‌তে পারবে না, কিন্তু আজ পাঁচির

আচরণে সে এইটুকু বুঝতে পেরেছিল, পাঁচি মরে গেলেও নেত্যকে ঘরে আনার মত দেবে না। পাঁচি সে বিষয়ে পাহাড়ের মত অটল। এখন হয় তাকে বোন্‌কে ছাড়তে হয়, নয় নেত্যকে ঘরে আনবার আশা একেবারে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু কোনটাই যে তার পক্ষে সম্ভব নয়! সমস্ত রাস্তা সে এই কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছে।

মেজেয় সীমেণ্ট দিতে দিতেও সে সেই কথাই ভাবছিল। পাঁচিকে ফেলে নেত্যকে নিয়ে ঘর করা তার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু নেত্যকে ছেড়ে দিলে যে কিছুই থাকে না জীবনের।

... ...

"হাতে কি পক্ষাঘাত হয়েছে, হাত নড়ছেনা কেন?"—

... ...

প্রকাণ্ড ইমারত তৈরী হচ্ছে। সব শুদ্ধ একশ' পঁচিশ জন মিস্ত্রী খাটে আর দেড়শ' মজুর মজুরণী। নেত্য ও কালাচাঁদ এক সঙ্গেই এখানে কাজে ভর্ত্তি হয়, কিন্তু বেশীদিন দুজনে কাছাকাছি কাজ করতে পায়নি। কাছাকাছি নম্বর হবার দরুণ আগে এক কাজেই দুজনে থাকলেও কিছুদিন পরে নেত্যর প্রতি সুরকীকলে জোগাড় দেবার আদেশ হয়। আজ কাল জলখাবার আর ছুটির সময় ছাড়া তাদের বড় একটা দেখা হয় না।

এই দুজনকে পৃথক করার মধ্যে কারুর কোন কারসাজি ছিল

এমন সন্দেহ করা হয়ত অন্যায়, কিন্তু কালাচাঁদের সে সন্দেহ ছিল। সুলো সামাদ্‌কে সে ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে না দেখে পারত না। সামান্য মিস্ত্রী থেকে সামাদ্‌ এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা পদে উঠেছে। ডান হাতটা তার ছিল না। এই ছিন্ন বাহুর কি একটা ভয়ঙ্কর ইতিহাস না কি আছে, সঙ্গী মিস্ত্রীদের ইঙ্গিতে সে মাঝে মাঝে তার আভাস মাত্র পেত। কিন্তু ডান হাত না থাকলেও সে কেমন করে' কণ্ট্রাক্টারের ডান হাত হয়ে উঠেছিল সে কাহিনী তার অজ্ঞাত ছিল না। এই কণ্ট্রাক্টারের সৌভাগ্য-সম্পদ নাকি এই অঙ্গহীন লোকটির অমানুষিক হৃদয়হীনতা নিষ্ঠুরতা ও কূটবুদ্ধির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে এখন এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তাঁর একমাত্র কাম্য হলেও তিনি সামাদ্‌কে ছাড়তে পারছিলেন না। তার ঔদ্ধত্য অসহ্য। মিস্ত্রী মজুরদের সামনেই সে তাঁর প্রতিবাদ করে' তাঁকে অমান্য করে' বাহাদুরী দেখাত।

নেত্য ও কালাচাঁদের ঘনিষ্ঠতা যে সামাদের চোখ এড়ায়নি কালাচাঁদ তা বুঝেছিল, কিন্তু তাদের পৃথক্‌ করার ভেতর তার কোন স্বার্থ সে খুঁজে পেত না। তবে আজ কাল যেন সামাদের দৃষ্টি তার দিকেই একটু বেশী, সর্ব্বদাই সে যেন তাকে অপমান করবার ছুতো খুঁজে বেড়ায়—

"এটা কার গাঁথুনি? কালাচাঁদের বুঝি? কিছু হয় নি—ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে' গাঁথ—"

"কি এমন লাট সাহেব মিস্ত্রী, তাগাড়টা নিজে আনতে পার না, না পার ত কাল থেকে কাজে এসো না।"

কোনদিন কালাচাঁদ এর অর্দ্ধেক অপমানও হয়ত সইতে পারত না, কিন্তু অনেকবার মাথা ঠুকে তার এতদিনে বোধ হয় সুবুদ্ধি হয়েছিল। সে আজ কাল নত হয়েই থাকে। তবে চোখ দুটো অবাধ্য, ঘৃণায় ক্রোধে তা থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়ে। সেই নিরুপায় নিষ্ফল ক্রোধটুকু বোধ হয় সামাদ্ উপভোগ করত।

কালাচাঁদ ক্ষিপ্রতর হাতে কাজে মন দিলে। সুখভোগ করার সময় হয়ত তার নেই—কিন্তু দুঃখের চিন্তার অবকাশও যে নেই এ কি কম সুবিধা!—

ইমারতের লাগাও সুরকীর কল। অত বড় বাড়ীতে প্রচুর সুরকীর প্রয়োজন। এত অধিক পরিমাণ সুরকী কেনার চেয়ে তৈরী করাতে লাভ বেশী বলে' কণ্ট্রাক্টার নিজেই এটা অস্থায়ী-ভাবে বসিয়েছেন। জলখাবারের ছুটি হয়েছিল। কালাচাঁদ সম্প্রতি কাজ রেখে তেতালা থেকে নেমে এল নেত্যর খোঁজে। মজুরণীরা রাস্তার কলের চারিধারে ভিড় করে' দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। নেত্যর হাত-পা ধোয়া সবে হয়েছে, কোমরে জড়ান গামছা খুলে সে হাত-পা মুছ্‌ছিল। কালাচাঁদকে দেখ্‌তে পেয়ে সে একটু হাস্‌লে।

"যা লো, তোর আর এক পেয়ারের লোক এয়েচে, আমায় বাপু একটু দোক্তা দিয়ে যা।"

পাশের প্রৌঢ়া মজুরণী বোধ হয় পানে ও দোক্তাতেই কালো দাঁতের মাড়ি পর্য্যন্ত বার করে' হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে। নেত্য একটা উপযুক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন ঝগড়া বাধালে মিছামিছি খানিক সময় নষ্ট হবে জেনে উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

"ও মা, তেজ দেখেচ, একটু দোক্তা চেয়েচি তাতেই এত?"

একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছায় ইট ভেজাবার বন্দোবস্ত ছিল। সেইখানটায় জলখাবারের সময় তারা রোজ গিয়ে বস্‌ত। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলে' কথা কইবার সুবিধা ছিল।

প্রথম কিছু অবান্তর কথার পর নেত্য বললে, "শ্রাবণ মাসের পোনেরো দিন এখনো বাকী, আমার কিন্তু আর এক দিনও একা থাক্‌তে ইচ্ছে নেই, মনে হয় আজই যাই—।"

কালাচাঁদের দিকে ফিরে সে হাস্‌তে লাগল।

নেত্যকে ঘরে আনা যে পাঁচির মেটেই অভিপ্রেত নয় সে কথা কালাচাঁদ নেত্যকে জানাতে পারে নি সঙ্কোচে। তা ছাড়া তার আশা ছিল শেষাশেষি পাঁচির মত হবেই; কিন্তু আজ তার মনে হ'লে এমন করে' নেত্যকে ভুল বুঝ্‌তে দেওয়া আর উচিত নয়।—কালাচাঁদ পাঁচির মতের আশায় এতদিন ধরে ক্রমাগত নানা ছুতোয় নেত্যর আসার দিন পেছিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দিন পেছুন' আর চলে না এবং নেত্যকে পাঁচির অমতে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। কিন্তু কেমন করে' নেত্যর কাছে পাঁচির অমতের কথা

পাড়বে ও এতদিন সে-কথা গোপন করার কি কৈফিয়ৎ দেবে কালাচাঁদ ভেবে পাচ্ছিল না।

কালাচাঁদকে চুপ করে' থাকৃতে দেখে নেত্য তার আর-একটু কাছে সরে গিয়ে বললে, "তোমাব কি অসুখ কবেছে নাকি গা—?"।

কালাচাঁদ শুধু মাথা নেড়ে জানালে,—"না—"

"তবে কথা কইচ না যে—"

"অমনি, ভাবচি—"

"আর অত ভাবেনা, ভেবে ত সব হবে!"—তারপর উৎসাহের স্বরে নেত্য বললে, "আমার রোজ বেড়েছে জানত?—যাই বল বাপু, সামাদ্ সর্দ্দার লোক ভালো,—এবার থেকে পুরোপুরি একটাকা দেবে বলেচে, বলে, 'কাজ যে বেশী করবে তাকে কেন বেশী রোজ দেব না? আমিত' মানুষ দেখি না, আমি কাজ দেখি, —ঠিক কথাই ত..."

কালাচাঁদ কি বল্‌তে গিয়ে নিজেকে সম্বরণ করে' নিলে।

যে গভীর আশঙ্কা তার মনে জাগ্‌ছিল, তাকে কেমন করে' নেত্যর কাছে সঙ্গতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে!

নেত্য উৎসাহিত হয়ে বলে' যাচ্ছিল, "তুমি অত ভয় পাও কেন বলত? আমাদের দুজনের কি এত খরচ যে তুমি ভয় পাচ্ছ, যা আমি রোজগার করব,—তোমার আয়ের সঙ্গে সেটা যোগ হবে। আর যদি তুমি অমনি একটা বিয়ে করতে? তিনটা

পেটত তোমার ওই আয়েতেই চল্‌ত ? লোকের ত তাও চল্‌ছে। ষষ্ঠীর তিনটে মেয়ে বৌ নিয়ে যদি চলে, তোমার চল্‌বে না ?”

হঠাৎ কালাচাঁদের পাঁচির অসম্মতি ও নিজের হৃদয়ের গভীর আশঙ্কার চেয়ে জরুরী একটা কথা মনে পড়ে গেল। পাঁচির সঙ্গে একথা নিয়ে বহু কলহ তার হয়ে গেছে, তবু এ কথাটা— সে বোধ হয় শুধু নেত্যকে অকারণ আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু আজ যখন আঘাতের ভয়টুকু উপেক্ষা না করলে কোন কথাই সত্য করে’ জানবার বা জানাবার উপায় ছিল না তখন মূল কথাটির জন্যেই আঘাতের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা সব চেয়ে সমীচীন মনে হ’ল।

কালাচাঁদ কথাটাকে গুছিয়ে ও কোমল করে’ বলবার নানা বিফল চেষ্টা করে’ অবশেষে হঠাৎ বলে’ ফেল্লে, “আমাদের বিয়ে কি রকম হবে নেত্য ?”

অপটু কালাচাঁদের মনের এই কথাটিকে সহজ করে’ বলার চেষ্টায় কি দুরবস্থা যে হয়েছিল তা অবশ্য নেত্যর জানা ছিল না। সে ভ্রূকুটি করে’ ঈষৎ হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, “আহা, ঠাট্টা করা কেন ?”

কালাচাঁদ বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে বল্লে, “ঠাট্টাত করিনি।”

“না ঠাট্টা নয়! বিয়ে আবার কি ?”

“বাঃ, বিয়ে নয় ত কি শ্যাল-কুকুরের মত ঘরকন্না হবে নাকি ?”

কালাচাঁদের মুখের অটল গাম্ভীর্য্যে একটু বিস্মিত ও বিচলিত হলেও এসব কথাকে পরিহাস ছাড়া অন্য কিছু বলে' ভাব্‌তে নেত্য পারেনি। সে ঈষৎ বিরক্ত মুখে বললে, "যাও, ইয়ার্কি ভাল লাগে না, বিয়ে আবার হবে কি করে?"

"আবার মানে? বিয়ে কি তোমার হয়েছিল নাকি?"

কালাচাঁদ আর যাই করুক, পরিহাস যে করছিল না, সে বিষয়ে নেত্যর এখন আর কোন সংশয়ের সুযোগ রইল না। কালাচাঁদের মুখ যেন কোন্ অসহ্য বেদনায় বিবর্ণ হয়ে এসেছিল।

নেত্য ভীত হয়ে বললে, "হয়েছিল ত, কিন্তু সে কি আর বিয়ে! সে ত মার মুখে না শুন্‌লে আমি জানতেও পারতাম না— কেন, তুমি জান্‌তে না?"

কালাচাঁদ অস্ফুটস্বরে বল্লে, "না, আমি ভেবেছিলাম—" —কিন্তু সে কিছুই ভাবেনি—তাই কথার মধ্যপথে থেমে সে অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল।

সে পাঁচির সঙ্গে নেত্যর কথা নিয়ে তর্ক করেছে বটে এবং নেত্য যে তার ঘরণী হবার অযোগ্য নয় সে কথা বার বার গলার জোরে প্রমাণও করেছে। কিন্তু সে প্রমাণ করার জন্য যুক্তি বা তথ্য কিছুর-ই সহায়তার প্রয়োজন হয় না—তার জন্যে ভাবতে হয় না। তা ছাড়া যে দুটি কারণ দেখিয়ে পাঁচি এ বিয়েতে আপত্তি তুলেচে তার একটি অর্থাৎ বয়স সম্বন্ধে যে কোন

কারণেই হোক্ কালাচাঁদের মন সংস্কারমুক্ত ছিল। পাঁচির দ্বিতীয় আপত্তি, নেত্যর জাতিগত হীনতায় কালাচাঁদ বিশ্বাস করত না, যদিও সে সম্বন্ধে নেত্যকে সে এতদিন আঘাত দেবার ভয়ে প্রশ্ন করে' উঠ্‌তে পারেনি। এই বয়স ও জাতির বাধার অতিরিক্ত কোন কথা চিন্তা ও কল্পনা করার সময়, শক্তি বা উৎসাহ কিছুই তাহার ছিল না। আজ সেই জাতির কথাই সোজাভাবে জিজ্ঞাসা করতে না পেরে ঘুরিয়ে বলবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বলেছিল,—"আমাদের বিয়ে কি রকম হবে নেত্য ?"

জাতিগত কোন বাধা যে তাদের বিবাহে নেই এই সান্ত্বনা-টুকুই সে আশা করেছিল নেত্যর মুখে। সেই উৎসুক প্রশ্নের এই নিদারুণ পরিণতিতে সে বিমূঢ় হয়ে বসে' রইল। তার সমস্ত দেহ ও মন নেত্যকে কামনা করে; সেই কামনার প্রাবল্যে সে বয়সের সংস্কার ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারে—এমন কি অপেক্ষাকৃত নীচ জাতি হলেও আপত্তি হয় ত না করতে পারে, কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান বিনা সে এই বিধবা যুবতীকে কেমন করে' গৃহে নিয়ে যায়, তাকে নিয়ে কেমন করে' সংসার করে ? হাজার হলেও সে পাঁচিরই ভাই !

কালাচাঁদের মুখের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে একান্ত শঙ্কিত হয়ে নেত্য কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ অতি নিকটে মৃদু হাসির শব্দে দুজনেই চম্‌কে উঠল।

পেছনে দাঁড়িয়ে সামাদ্ হাসছিল—ক্রূর ব্যঙ্গের হাসি। সে

হাসিতে তার কদর্য্য মুখের পৈশাচিক বীভৎসতা ভীষণতর হয়ে উঠেছিল।

তাদের মুখ ফেরাতে দেখে সে হঠাৎ বাঁ-হাতে মাথার কাপড়ের টুপিটা খুলে অপরূপ ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে সেলাম করে বললে, "কসুর মাপ করবেন, আপনাদের জল খাবারের ছুটি যে অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে সেই কথাটা জানাতে এলাম। একটু কষ্ট করে, গা তুলবেন কি?"

—সতেরো—

ছুটি হয়ে গেছল। সুরকীর কলের মজুর মজুরণীরা গায়ের ও কাপড়ের সুরকী ঝেড়ে বেরিয়ে পড়ছিল।

দোক্তা না দিয়ে তেজ দেখাবার জন্যে কাতি অর্থাৎ কাত্যায়ণী বুড়ি নেত্যর উপর বেশ একটু চটেই ছিল। জল খাবারের ছুটির পর সমস্ত বিকাল সে নেত্যর বিরুদ্ধে দল পাকাবার চেষ্টা করেছে। এখন কয়েকজন মজুরণীর সঙ্গে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে বাড়ী ফেরবার মুখে পথের মোড়ে নেত্যকে দেখতে পেয়ে সে সকলকে একটু চোখ মটকে ইসারা করলে, "এখনো দাঁড়িয়ে কেন লা, ঘর যাবি না?"

নেত্য অবশ্য দোক্তার ব্যাপার বিস্মৃত হয়েছিল; সে সহজ ভাবে উত্তর দিলে, "একটু কাজ আছে ভাই—।"

মুখটা তার যেন অত্যন্ত কাতর!

একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি সকলের মাঝে বিনিময় হয়ে গেল। একজন হঠাৎ কাতির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তোর আজ-কাল এত কি কাজ লা? জল খাবারের ছুটির পর ত দেড়ঘণ্টা দেরী করে, কাজে এলি, ছিলি কোথায়—?"

সকলে মুখ টিপে হাসতে লাগল, কিন্তু কাতি বিরক্ত হয়ে

বললে, "তুই সব তাতে আগে কথা কইতে আসিস্ কেন, বল্‌ত সখী ? তোর বড় দোষ !"

কাতির বিরক্ত হবার কথা বটে ! জল খাবারের ছুটি শেষ হবার পর নেত্যর অনুপস্থিতি কাতিই লক্ষ্য করেছে—এবং এই প্রশ্ন উত্থাপন করার কল্পনা ও প্রস্তাব সেই প্রথম করে। সুতরাং তার ন্যায্য অধিকার এই প্রশ্ন করার গৌরব চুরি করে বাহাদুরী দেখান সে কেমন করে বরদাস্ত করতে পারে !

সখি কিন্তু কাতির বিরক্তিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে পৃষ্ঠ-পোষকতায় উৎসাহিত হয়ে উটের মত লম্বা গলাটা বাড়িয়ে মুখভঙ্গি করে বললে, "কেন, কইব না কেন ! ভয় করি নাকি ? না হয় আমাদের রোজ এক টাকা নাই হোল, না হয় আমাদের ছেনালি নেই বলে কেউ খাতির করে না, না হয় আমাদের জল খাবারের দু'ঘণ্টা ছুটি মেলে না—"

কাতি আর সহ্য করতে পারলে না। তার বহু চেষ্টায় বহু যত্নে আহরিত অস্ত্রগুলি আরেকজন এমন নির্লজ্জভাবে আত্মসাৎ করে তার সামনেই প্রয়োগ করে বাহাদুরী নেবে ; এমন বেয়াদবীতে তার হাড় পর্য্যন্ত জ্বালা করে উঠ্‌ল, সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠে বল্লে,—"তুই কি জানিস্ ! তুই নিজে দেখেচিস্ কাউকে এক টাকা রোজ নিতে ? নিজের হাঁড়ি সামলে পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতে যাস্ লো সখি !"

এবারে কাতির দাঁত খিঁচুনির ভালো অর্থ একটু টেনে করতে

হয় বটে,—কিন্তু খট্‌কা লাগলেও তা অগ্রাহ্য করে সখী লম্বা বেঢপ হাড্ডিসার হাত দুটো নেড়ে বল্লে, "আমি সব জানি লো সব জানি! আমি কেন সব্বাই জানে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কদিন—কদিন থাকে লা—"

প্রথমে তাদের ইসারা ইঙ্গিত ও মুখ টেপা হাসি লক্ষ্য না করলেও তাদের অভিপ্রায় বেশীক্ষণ নেত্যর অগোচর রইল না। সে বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে সরে গেল। কিন্তু তখন সখীতে ও কাতিতে রীতিমত বেধে গেছে, নেত্যকে আর তাদের প্রয়োজন ছিল না।

সখীর পুরুষালি ঢঙের সৌষ্ঠবহীন চেহারার প্রতি বিদ্রূপ করে কাতি বলছিল, "হাঁলো মদ্দানি! ভাত না পেয়ে ভেক্ নিয়েছিস্ তা জানি! এখন পরের মাছ দেখে ঈর্ষেয় মরে যাচ্ছিস্।"

* * * *

প্রতিদিন কাজের পর ওই মোড়ে একত্র হয়ে নেত্য ও কালাচাঁদ ঘরে ফেরে এক সঙ্গে। আজ কালাচাঁদের দুর্ব্বোধ্য আচরণে অন্তরে অন্তরে নিতান্ত শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লেও কাজের পর কালাচাঁদ তার সঙ্গে দেখা না করেই একলা চলে যাবে এমন কথা নেত্য ভাবতে পারেনি। তার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার ও অনেক কথা বলবার ছিল। সামাদের আকস্মিক

আবির্ভাবে বাধা পেয়ে তারা যে যার কাজে চলে যায়। আর কোন কথা কইবার অবসর তারা পায়নি। কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যে নেত্যর দুশ্চিন্তার আর অবধি ছিল না। তার অনুচ্চারিত প্রশ্ন মনের মাঝে কেবলি ঘুরে ঘুরে আপনা হতেই একটির পর একটি অশুভ উত্তরের দুঃস্বপ্ন রচনা করছিল।

কিন্তু কাজের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও সে কালাচাঁদের দেখা পেল না। এক এক করে প্রায় সমস্ত মিস্ত্রী ও মজুর বেরিয়ে গেল, তবু কালাচাঁদের দেখা নেই।

কাতি ও সখীর দলের ব্যঙ্গ সম্ভাষণ পাবার কিছু আগেই সে একবার ইমারতের ভেতরে গিয়ে সন্ধান করবার সঙ্কল্প করছিল।

তাদের ঝগড়ার সুযোগে সেখান থেকে সরে এসে সে ইমারতের দিকে চল্‌ল। সেখানে আর লোক ছিল না। বাড়ীতে এখনো বালি-কাম হয়নি, আগা-পাস্তালা ভারা বাঁধা বিশাল নির্জ্জন বাড়ীটাকে যেন সদ্য হাঁসপাতাল-ফেরৎ পঙ্গুর মত অসহায় দেখাচ্ছিল। এখনো কালাচাঁদের এখানে থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবু একবার সমস্ত বাড়ীটা না খুঁজে ফিরতে নেত্যর মন সরছিল না। বাঁধানো সিঁড়ি এখনো তৈরী হয়নি। নড়বড়ে একটা বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে মিস্ত্রী ও মজুরেরা ওঠানামা কো'রত। একতলার ঘরগুলো খুঁজে এসে দোতালায়

কাউকে পাওয়া যাবে না, একথা ভাল রকম জানলেও নেত্য সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌ল।

দোতালায় কেউ ছিল না। নেত্য অকারণে চার-পাঁচ বার প্রত্যেক ঘর ও বারান্দা ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াল। তার আর নামতে ইচ্ছে করছিল না। নামলেই যে তার সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিতে হয়—নামলেই যে তার অনিচ্ছুক বিদ্রোহী মনকে নিজের কাছে স্বীকার করতেই হয় যে, একটি দিনের জন্যেও কালাচাঁদ তার জন্যে অপেক্ষা না করে, তাকে সঙ্গে না নিয়ে একলা বাড়ী চলে গেছে—তাকে উপেক্ষা করে! নীচে নামলে আর যে এই উপেক্ষাকে অস্বীকার করবার কোন উপায় থাকে না।

তেতালার মাত্র দেয়াল উঠেছে। ছাদের কাজ এখনো সবই বাকী; সবে টালি বসান স্থুরু হয়েছে। বাঁশের সিঁড়িও সেখানে ছিল না, শুধু মিস্ত্রিদের কাজ করবার জন্য বাঁশের ভারা বাঁধা ছিল। আফিসের বাড়ী বলে সাধারণ বাসের বাড়ীর চেয়ে এ বাড়ীর আয়তন ও উচ্চতা কিছু বেশী। দোতালা থেকেই নেত্য অন্যান্য বাড়ীর তেতালার ছাদ বেশ দেখতে পাচ্ছিল। তা ছাড়া শুধু পুরুষেরা তেতালার দেওয়ালের কাজ করে বলে ভারার বাঁশগুলির মধ্যে ব্যবধান মেয়েদের ওঠরার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়। নেত্য অনেকক্ষণ ধরে একটি রেলিং-হীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে সহরের বাড়ী বাগান পথের জটিল সমষ্টির দিকে অন্য

মনে চেয়ে কি ভাবতে লাগল। অন্ধকার হয়ে আসছিল। নীচের অনেক রাস্তায় বাতি জ্বালা হয়ে গেল, চলন্ত গাড়ী ও মোটরেও আলো জ্বলে উঠছিল। হঠাৎ নেত্য খোলা বারান্দা থেকে পা বাড়িয়ে ভারার ধাপে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় এই সাধ্যাতীত আরোহণ প্রয়াসে দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে কম্পিত দেহ আর এক ধাপ ঊর্দ্ধে তুল্‌ল, তারপর আর এক, ক্রমশঃ আরো—

* * * *

সামাদ সর্দ্দারের কাছে অপমানিত হয়ে কালাচাঁদ এবারেও নীরবে এসে কাজে যোগ দিল। সামাদের অপমান তার গায়েই যেন লাগেনি। তার মনে হচ্ছিল কিছুতেই আর যেন তার যায় আসে না। সমস্ত উৎসাহের উৎস তার একেবারে শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। তার কাজের মধ্যে আরো দু'-তিনবার সামাদ এসে তদারক করে গেল; দু'-একটা দোষ ত্রুটিও ধরিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু কালাচাঁদ শুধু নীরব ঔদাসীন্যে সমস্ত মেনে নিয়ে কাজ করে যেতে লাগল। চোখের আগুনও তার নিভে গেছল।

ছুটি হবার পর সে বেরিয়ে পড়ল এবং মোড়ে দাঁড়াবার কথা আপনা হতেই স্মরণ হলেও আজ আর সেখানে অপেক্ষা করলে না। পাঁচি সমস্ত দিন একলা জ্বর নিয়ে পড়ে আছে, একটু জল মুখে দেবারও লোক নেই। সেখানে যাওয়া যে তার সব চেয়ে

আগেই দরকার। না দাঁড়াবার এই কৈফিয়ৎ দিয়েই নিজের কাছে প্রকাশ্যভাবে সে নিজেকে সমর্থন করলে।

তার মনে একটি গোপন আশঙ্কাও ছিল যে, হয়ত তার অপেক্ষা করা বৃথা হবে, নেত্য আজ আর তার সঙ্গে দেখা করবে না!

কিন্তু পাঁচির জ্বরের ছুতোয় নেত্যর সঙ্গে মোড়ে দেখা না ক'রে প্রতিদিনের নিয়ম ভঙ্গ কর্‌লেও, তার গতিতে ঘরে যাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ততা দেখা গেল না। তার মনের মধ্যে সমস্ত বিভিন্ন ও বিরোধী ভাবনা-চিন্তার জট পাকিয়ে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে সরল ক'রে এই দিনটির চরম পরিণতিটুকু উপলব্ধি কর্‌বার ক্ষমতা তার ছিল না। সমস্ত দেহে ও মনে সে শুধু একটা বেদনাময় শ্রান্তি অনুভব কর্‌ছিল। পথে যেতে যেতে কেবলি পাঁচির জ্বরের ঘোরে অসহায় অবস্থার কথা মনে হলেও পায়ের গতি দ্রুত কর্‌বার প্রবৃত্তি তার হচ্ছিল না। যেখানে এসে প্রতিদিন সে ও নেত্য আলাদা হয়, সেই দুটি পথের সঙ্গমে এসে সে থাম্‌ল। পাঁচির অসুখ! হয়ত জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। তাকে যেতেই হবে। সে বাড়ীর পথে চলল।

কিন্তু নেত্যর সঙ্গে একেবারে সব মিটমাট ক'রে ফেল্‌লে ভাল হত না কি? সমস্ত কথা খোলসা ক'রে বলে এই অনিশ্চয়তার উদ্বেগ একেবারে ঘুচিয়ে দেওয়া কি ভালো নয়?

কালাচাঁদ আবার ফিরল; এবার নেত্যর ঘরের দিকে।

কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার মনে হচ্ছিল, সে যেন জ্বরে চেতনাহীন তৃষ্ণার্ত্ত পাঁচির আহ্বান শুন্‌তে পেয়েও অবহেলা করে চলেছে। অকারণে তার অবাধ্য মন অসহায়, তৃষ্ণার্ত্ত, কাতর পাঁচির একটা অতি স্পষ্ট ছবি তাব সাম্‌নে বার বার তুলে তাকে বিদ্রূপ করছিল। তবু কালাচাঁদ থামল না। নেত্যর ঘরের সাম্‌নে এসে তার দরজা তালা বন্ধ দেখেও সে ঘরের দিকে না ফিরে আবাব কাজের জায়গার দিকেই চল্‌ল।

তখনও তার তৃষ্ণার্ত্ত ছোট বোনটি তার মনের মধ্যে অতি কাতরভাবে একটু জল চাইছে।

—আঠারো—

কাজের জায়গা পর্য্যন্ত কালাচাঁদকে যেতে হ'ল না। পথে নেত্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু দেখা হ'বা মাত্রই তার সঙ্গে ফিরলে স্বীকার কর্‌তে হয় যে, তার সঙ্গে দেখা করাই এ পথে আসার উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্য স্বীকার করা কালাচাঁদের পক্ষে হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল।

"আরে নেত্য যে! মাইরি দাঁড়া একটু, এই চারটি পয়সার বিড়ি কিনেই আস্‌ছি—!"

সৌভাগ্যক্রমে নিকটস্থ বিড়ির দোকানটা তার চোখে পড়েছিল। নিজের উদ্ভাবনী শক্তিতে বেশ একটু খুশী হয়েই সে বিড়ির দোকানের দিকে ব্যস্তভাবে ছুট্‌ল।

"আমার বলে মরবার সময় নেই, দাঁড়াবে! এত রাত্রে গিয়ে কখন যে রান্না চড়াব আর কখনই বা গিল্‌ব তা জানি না।" নেত্য কালাচাঁদের অনুরোধের সম্মান না রেখে এগিয়ে চল্‌ল।

বিড়ি কটা কিনে নিয়ে ছুটে গিয়ে নেত্যর নাগাল ধরে কালাচাঁদ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌তে বল্‌তে চল্‌ল, "বিড়ির দোকান এ তল্লাটে যদি থাকে ত এই একটি আছে, জানিস্ নেত্য?"

নেত্যর দিক্ থেকে বিড়ির দোকানের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কোন কৌতূহলের আভাস পাওয়া গেল না—

"এমন মিঠে-কড়া বিড়ি আর কোথাও পাবি না—, নইলে সেই কোন মুল্লুক থেকে এখানে আসি—বিড়ি কিন্‌তে ?"

নিজের কাছেই নিজের কৈফিয়ৎটা কেমন জোলো ঠেক্‌ছিল! নেত্যর দিক থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কালাচাঁদ কৈফিয়ৎ ছেড়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোর যে এত দেরী হ'ল নেত্য ? গেছ্‌লি কোথায় ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিলে হয়ত তার লজ্জাকর ব্যর্থ প্রতীক্ষার কাহিনী আঁচ করে ধরবার সুযোগ কালাচাঁদ পায়, সুতরাং আর নেত্যর নীরব থাকা হ'ল না।

"যাব আর কোন চুলোয়—! সই রোজ রোজ বলে একবাবটি আসিস্ নেত্য, তাই দেখতে গেছলুম।"

কালাচাঁদ আশ্চর্য্য হ'ল। প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে কেন সে আজ নেত্যর অপেক্ষায় দাঁড়ায়নি তার কৈফিয়ৎ নেত্য তাহ'লে আর চাইবে না—! কিন্তু কৈফিয়ৎ না চাওয়ার জন্য নেত্যর ওপর তার মন অকারণে হঠাৎ রাগ যে কেন করে বসল তা সে বুঝতে পারে না—এবং এতক্ষণে তার মনে পড়ল নেত্যর কাছ থেকে আজ সে কল্পিত ও সত্য সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করার সঙ্কল্প করে বিদায় নিতে এসেছে।

বিদায় নেবার ভূমিকাটা এ পর্য্যন্ত যথাযথ হয়নি বটে, কিন্তু দেরী করাও আর যায় না। অসুস্থ পাঁচি যে একলা ঘরে আছে!

কিন্তু সে কথা আরম্ভ করাও যে শক্ত! যদি নেত্য তার জাতির ও বৈধ্যবের কথা তুলে বিবাহে আপত্তি জানালে নিজেকে অপমানিত বোধ করে! তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর্‌তে হবে বলে' তাকে আঘাত দেবার কোন দরকার আছে কি?

কালাচাঁদ শুধু বল্‌লে, "তোর সঙ্গে একটা কথা আছে নেত্য, জরুরী কথা!"

এই একটি জরুরী কথাই নেত্য সন্ধ্যার পর থেকে আশঙ্কা করে শিউরে উঠ্‌ছিল—! ক্ষাণ কম্পিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে —"কি?"

"চল্‌না বল্‌ছি।"

দুজনে নীরবে এগিয়ে চল্‌ল। সহরের ভদ্র পল্লী ছাড়িয়ে ক্রমশঃ তারা সহরতলীর ইতর পাড়ায় এসে পড়েছে। গ্যাসের আলোর যায়গায় পথের দূরে দূরে কেরোসিনের বাতি মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছিল। পথও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছ,—কর্দ্দমাক্ত, দুর্গন্ধ, নোংরা!

সঙ্কীর্ণতর আর একটা গলিতে বেঁকে নেত্য আবার জিজ্ঞাসা করল, "কি কথা বল্‌লে না—?"

"বল্‌ছি, অত তাড়া কিসের! না হয় আজ তোর বাড়ী দুটি খাব, খেতে দিবি না?"

"তা খাও না। আমার রান্না'ত পছন্দ হয় না, তাই এতদিন বলে বলেও খাওয়াতে পার্‌লুম না। আজ খাবেত, বল।"

নেত্যর আশা হচ্ছিল, কথাটা এমন কিছু নাও হ'তে পারে—, না হওয়াই সম্ভব।

"না না, খাব কি? ঠাট্টা করে' বল্লুম বলে! আমার এক্ষুণি বাড়ী যেতে হবে—!"

"আমায় ত শুধু ঠাট্টাই করবে! কেন এক্ষুণি বাড়ী না গেলে আর চলে না—?"

এক্ষুণি বাড়ী না গেলে যে কেন চলে না—সে কথা জানাতে গেলে নিজের কাছে নিজের আচরণের জবাবদিহি করা বোধ হয় একটু বেশী কঠিন হয়ে পড়ে, তাই কালাচাঁদ সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বল্লে,—"না না, অনেক রাত হয়েছে—দেখ্ছিস্ না—।" তারপর খানিক থেমে বল্লে, "না হয় কালই তোকে সব বলব খ'ন, বুঝিচিস্ নেত্য, এখন যাই।"

যত সময় যাচ্ছিল পাঁচির প্রতি তার কর্ত্তব্যের অবহেলা তাকে তত অধৈর্য্য করে' তুলছিল।

খপ্ করে' কালাচাঁদের হাতটা ধরে ফেলে নেত্য বল্লে,—"না না, এখন কিছুতেই যাওয়া হবে না; খাও না খাও এই এতখানি পথ হেঁটে এসে একটু না জিরিয়ে তোমায় যেতে হবে না।"

কালাচাঁদ সে হাতের আকর্ষণ অমান্য না করে আপত্তির স্বরে বল্লে, "এত রাত্রে লোকে কি ভাব্বে বল্ত?"

"কি আবার ভাব্বে? ভাবুক না যা খুশী।"

কালাচাঁদ শুধু অনুভব ক'র্‌ল তার প্রিয়তমার মুষ্টি তার হাতের ওপর দৃঢ়তর হ'ল! ভাবুক যে যা' খুসী! কুছ পরোয়া নেই—এই ত' উচ্ছৃঙ্খল, নির্ভয়, বে-পরোয়া যৌবনের বাণী! মজুরের রক্তস্রোতে যৌবন ত' ভিন্ন ভাষায় কথা কয় না! হয়ত কালাচাঁদ নিজের সঙ্গে কিছু সংগ্রাম করেছিল, হয়ত একবার মনে হয়েছিল আসন্ন দুর্যোগের অজুহাত দেখিয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু নীরব মুষ্টির আকর্ষণ সমস্ত অজুহাতকে উপহাস করে যে!

নেত্য দরজার তালা খুল্‌লে চাবী দিয়ে। বাড়ীওয়ালী গয়লানী সামনের আটচালায় ডিবিয়া নিয়ে গোশালার তত্ত্বাবধান ক'রছিল বোধ হয়। জিজ্ঞেস্‌ ক'রলে, "এত রাত হ'ল যে নেত্য?"

"এই হ'ল!"—বলে' নেত্য দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে কালাচাঁদকে আহ্বান করলে।

ডিবিয়ার ক্ষীণ আলোকেও দূর থেকে গয়লানী বোধ হয় কালাচাঁদকে দেখতে পেয়েছিল। গোয়ালের তত্ত্বাবধান ছেড়ে কৌতূহলী হ'য়ে এগিয়ে এসে বল্লে, "আমি আবার ভেবে মরি! তা এখন আর রান্না বান্না হবে কি ক'রে?"

সন্দেহমিশ্রিত কুৎসিত কৌতুকে তার ফোলা মুখের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন উপভোগ্য; কিন্তু নেত্যর সময় ছিল না। মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে সে বল্লে, "অত আদিখ্যেতা আবার কবে থেকে হলো গো তোমার? আমার খাবার জন্যে ভেবে মর্‌ছ! হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি? রাস্তা থেকে লোক ধরে' এনেছি!"

"ওমা, ভাল কথা বল্‌তে এলাম ত' মুখ দেখ না। 'হাঁ ক'রে দেখছ কি?' হাঁ ক'রে দেখবো কেন লা? আমরা কি আর পুরুষমানুষ দেখিনি—না আমাদের বয়েস ছিল না? এতদিনে তোব সুমতি হয়েছে তাই একটু আহ্লাদ জানাতে এলুম তা মুখ দেখ না? ঝাঁটা মার!"...গয়লানী বক্‌বক্‌ কব্‌তে কর্‌তে বেরিয়ে চলে গেল।

কালাচাঁদের হঠাৎ মনে হ'ল ঘরেব বন্ধ বাতাসে নিশ্বাস আর টানা যাচ্ছে না।

"না নেত্য, আমাব থাক্‌বার উপায় নেই। বৃষ্টি থাম্‌বার আগেই আমায় পৌঁছতে হবে।"

নেত্য কিছু বল্‌লে না, কিন্তু কাতর করুণ দুটি চোখ তুলে তার দিকে শুধু তাকালো। সেই দৃষ্টিতে অনাদিকালের সমস্ত প্রিয়-বিরহ-শঙ্কিতা নারীর অশ্রুসিক্ত মিনতি। সে দৃষ্টিকে অবিশ্বাস কবা যায় না, তার অসম্মান করা অসম্ভব!

সমস্ত সঙ্কল্প ও সংস্কাবগত সমস্ত দ্বিধা পরিত্যাগ করে' কালাচাঁদ বল্লে, "আচ্ছা, আমি আজ আর তোর ভাত না খেয়ে যাচ্ছিনে, কেমন হ'ল ত? কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি কর্‌ নেত্য।"

এত দেরী যখন হয়েছে, আর একটু দেরী হ'লে পাঁচির খুব বেশী ক্ষতি বোধ হয় হবে না; আর সে কথা নেত্যকে ত অন্য দিন জানালেও চলে।

কালাচাঁদ নেত্যর রন্ধনের উদ্যোগ বসে বসে দেখ্‌তে লাগলো।

"আর ত কিছু নেই; বৃষ্টির দিন ডালে-চালে চড়িয়ে দিই কেমন?"

..."তুমি আবার বেশী ঝাল খাও না!..."

..."তুমি না এলে আজ আর হাঁড়ি ঠেলতুম্ ভেবেছ? দুটো মুড়ি চিবিয়ে পড়ে থাকতুম।"...

"তাই কেন ক'রলি না, এত হ্যাঙ্গামা করবার কি দরকার ছিল?"

"কি ছিল তা তুমি কি বুঝবে?"

নেত্য কটাক্ষ হেনে হাস্‌ল।

এক পশলা বৃষ্টি রান্না খাওয়ার মধ্যে হ'য়ে গেল...

কালাচাঁদ পান নিয়ে বল্লে, "চল্লুম তাহ'লে নেত্য?"

নেত্য মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইল।

"চল্‌লুম, বুঝেছিস্?"

"না বুঝিনি। এক্ষুণি ত আবার বৃষ্টি আসবে।"

"তা বলে' সমস্ত রাত এখানে বসে থাক্‌ব নাকি?"

"তা থাকলেই বা।"—নেত্যর হঠাৎ বাইরে কি দরকার পড়ে গেল।

কালাচাঁদ খানিক দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু নেত্য এল না। বাইরে বেরিয়েও নেত্যকে কোথাও দেখা গেল না। কিন্তু আর অপেক্ষা

করা যায় কেমন করে' ? অদৃশ্য নেত্যর উদ্দেশে "তাহ'লে আসি নেত্য" হেঁকে কালাচাঁদ বেরিয়ে পড়ল।

অন্ধকার কর্দ্দমাক্ত পথ! তারাহীন আকাশ বিদীর্ণ করে' বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। খানিকদূর যেতেই আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামল প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে। কিন্তু পাঁচি যে একা আছে! ভিজে ভিজেই কালাচাঁদ চল্‌ল ; অদূরে সশব্দে একটা বাজ পড়ল।

* * * *

দরজা যে কারণেই হোক্ শুধু ভেজান ছিল, ঠেলতে কালাচাঁদকে হ'ল না, একটু আঘাতেই খুলে গেল। একটা কেরোসিনের ডিবে বাতাসের অত্যাচারে নিবু নিবু হলেও কোন রকমে আত্মরক্ষা করে ছিল। কালাচাঁদ দরজাটা বন্ধ করে' দিলে। বিছানার একপাশে নেত্য বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিল, তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

—উনিশ—

অনেকদিন বাদে আহ্লাদী বাড়ী এসেছে, আস্‌তে সে চায়নি কিন্তু তার মার বিশেষ জেদে তাকে আসতেই হয়েছে।

"জানো মা, মিস্ রিং কি-রকম লম্বা? হোই বাবার মাথার ওপর আর এক হাত, আর তেমনি রোগা, যেন বের্ষ কাঠ! অত বড় ধাড়ী মাগি মা, বিয়ে হয় নি! আমি প্রথম ভেবেছিলুম বুঝি 'ফাদারের' বৌ!"

" 'ফাদার'—কে?"

"ওই যে সাহেব গো, তাকে আমরা 'ফাদার' বলি কিনা!"

"মিছ্রীং ফাদারের কে হয় তা হলে?"

"কে আবার হয়? কেউ না।"

আহ্লাদীর মা কাপড় কাচা থামিয়ে গালে হাত দিয়ে চোখ দুটো প্রায় বার ক'রে বল্‌লে, "ওমা! ওই অত বড় আইবুড়ো মাগি পরপুরুষের সঙ্গে অমন ক'রে থাকে?"

"সঙ্গে থাক্‌বে কেন? মিস্ রিং-এর ঘর আলাদা, ফাদারের আলাদা। ওরা ত' আর বর কনে নয়।"

"হোক্ ঘর আলাদা; এক জায়গায় থাকে ত'? মাগো কি ঘেন্না!"

এমনিতর তাদের কথাবার্ত্তা হয়। আহ্লাদী অনেক কিছু দেখে এসেছে, অনেক নতুন কিছু শিখে এসেছে; সে সমস্ত বল্‌বার জন্যে, তা নিয়ে বাহাদুরী করবার জন্যে তার বুক আই-ঢাই করে, কিন্তু এই বড় দুঃখ যে, মা সে সব কথা বড় বেশী বোঝে না এবং মাকে শুনিয়েও বেশী লাভ নেই। তার নতুন সেমিজ ও কাপড় ক'টাকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার সে পরে আর তুলে রাখে।

শশী এসে মাকে তাড়া দিয়ে বলে, "ভাত দে মা শীগ্‌গীর, বড় ক্ষিদে। কি-রে দিদি কখন এলি?"

আহ্লাদী তাড়াতাড়ি বই, খাতা, শ্লেট বার ক'রে হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা আরম্ভ করে, শশীর কথা তার কানেও যায় না।

শশী কাছে এসে শ্লেটটায় টান্ দিয়ে বলে, "শুন্‌তে পাস্‌নে—ডাক্‌ছি।"

"জ্বালাতন করিস্ নি শশী, আমার বলে' এই ছুটির মধ্যে কতখানি পড়া শেষ করতে হবে! বাবা, মিস রিং এমন নয়! বেঞ্চির ওপর মুখে আঙ্গুল দিয়ে দু'ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখবে! যীশুর গান তিনবার ক'রে মুখস্থ বলাবে···"

শশী শেষ পর্য্যন্ত শোনে না। "মিস্ রিং না ফিং" ব'লে বিদ্রূপ ক'রে বেরিয়ে চলে যায়!

আহ্লাদীকে আকাশ থেকে ধূলোয় নেমে তখন ডাক্‌তেই হয়, "শোন্ না শশী, সে রকম ইস্কুল তুই কখন দেখিস্‌নি।"

শশী দূর থেকে বলে, "তুই দেখিচিস তো ? তোর পাঁচটা হাত বেরিয়েছে তো, তাহ'লেই হ'ল। আমার দেখে কাজ নেই।"

বিষণ্ণ মুখে আহ্লাদী বই শ্লেট কোলে করে' খানিক বসে থাকে, তারপর রাগ করে' সেগুলো তুলে রাখে।

মা ডেকে বলে, "একটু ছিঁচ্‌কে করেছে আহ্লাদী, কাপড়গুলো মেলে দে।"

"পার্‌ব না আমি।"

"কি ! পার্‌বি না কি ? অমন মুখ কর্‌লে নোড়া দিয়ে থেঁৎলে দেব আহ্লাদী, শীগ্‌গীর যা !"

"না, পার্‌ব না আমি। আমায় কেন স্কুল থেকে আন্‌লে ? আমি এখানে থাক্‌ব না, আমায় পাঠিয়ে দাও !"

"বটে !"—মা এসে গোটাকতক কিল বসিয়ে দেয়, তার ওপর লাথি মেরে ঠেলে দিয়ে বলে, "পারবি না ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! উনি দু'দিন খেরেস্তানের ইস্কুলে গিয়ে ধিঙ্গি হ'য়েছেন, রোসো, তোমার আবার সেখানে যাওয়া অমি বা'র কর্‌ছি !"

ইস্কুলে ফিরে না যেতে পাওয়ার সম্ভাবনায় অত্যন্ত ভীত হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে আহ্লাদী উঠে যায়।

শশী ব্যঙ্গ ক'রে বলে, "কি গো মিস্ ফিং ! কাঁদছ কেন !"

বাপের সঙ্গে তাদের দেখাশুনা চিরকালই খুব কম। তিনকড়ি রাত্রে শুতে ঘরে আসে এবং দু'বেলা দু'বার ঘরে এসে খেয়ে যায় মাত্র। সমস্ত দিন তার বাইরের ঘরটিতে সে শুধু

স্যুট্‌কেসই তৈরী করে। কিন্তু আহ্লাদী হঠাৎ একদিন আবিষ্কার কর্‌ল যে তাব বাপের মত অমন অক্লান্ত বিরক্তিহীন শ্রোতা আর নেই। মা'র হাত থেকে ছাড়া পেলেই সে এখন বাপের কাছে গিয়ে বসে।

"এই ক'দিন বাদে আবার আমায় সেখানে পাঠিয়ে দেবে ত বাবা?"

"আর সেখানে গিয়ে কি হবে মা?"

"না বাবা, তুমি পাঠিয়ে দেবে বলে' এনেছ! তোমায় পাঠিয়ে দিতে হবে!"

"আচ্ছা, দেব মা।"

খানিক গেলে আহ্লাদী বল্‌তে আরম্ভ করে, "সেখানে বাবা, খুব ভাল,—সকাল বেলা ঘণ্টা বাজল, অমনি উঠলুম—মুখটুখ ধুলুম, তার পরেই খাবার—শুন্‌ছ ত বাবা?"

"হুঁ।"

"তার পর কাঠের ডেস্কে বসে—ডেস্ক কি জান ত বাবা।"

"হুঁ।"

আহ্লাদীর সন্দেহ হয় বাবা বোধ হয় মন দিয়ে শুন্‌ছে না। তবু খানিকক্ষণ সেখানকার কথা বিনা বাধায় বল্‌তে পাওয়াতে যথেষ্ট আনন্দ আছে। আহ্লাদী সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তার প্রতিদিনের কার্য্যের তালিকা দিয়ে যায়—, স্কুলের সঙ্গিনীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে—এবং অবশেষে ক্লান্ত হয়েই উঠে যায়।—

সকালে উঠে একদিন আহ্লাদী জিজ্ঞাসা করলে, "মা—আজ রবিবার না ?"

"অতশত জানি না বাপু!"—বলে' মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল,—কিন্তু খানিক বাদে ঘর থেকে অদ্ভুত চীৎকার শুনে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"ও আবার কি ঢঙ্‌রে আহ্লাদী।"

আহ্লাদী তখন হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে উচ্চস্বরে গান আরম্ভ করেছে,

"আমরা অবোধ শিশু ;
তুমি ত্রাতা পিতা যীশু……"

আহ্লাদীর মা বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে শশী হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে ও তার হাসিকে উপেক্ষা করে' আহ্লাদীর অবিচলিতভাবে গান চলেছে।

"কি হচ্ছে আহ্লাদী!"

গান থামিয়ে গম্ভীর স্বরে আহ্লাদী বললে, "বা! 'পেরার' করছি ত!" তার পর মা ও ভায়ের অজ্ঞতা দূর করবার জন্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝালে, যে রবিবার সকাল বেলা উঠে এমনি করতে হয়।

"না করলে যে ঈশ্বর রাগ করেন! খেঁদি একদিন শশীর মত হেসেছিল, তাকে মিস্ রিং কি-রকম বক্‌লেন, বল্লেন—হাসলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না! সেখানে একবার ও-রকম করে' হেসে দেখিস দিকি শশী!"

আহ্লাদী অর্দ্ধসমাপ্ত গান আবার আরম্ভ করবার উদ্যোগ করছে দেখে মা তার ঘাড়টা ধবে ঝাকুনি দিয়ে বললে,—"ঢের বেয়াক্কিলেপনা হয়েছে, এখন ঘুঁটেগুলো দেয়াল থেকে ছাড়াও গিয়ে দেখি! গান গাইতে আর হবে না!"

আজকের অপমানটা আহ্লাদীর বড় বেশী বাজল। সে গোঁজ হ'য়ে বসে রইল, নড়ল না। ধমক খেয়ে জানালে— আজ রবিবার, তাকে কাজ কব্‌তে নেই।

নড়াটা ধরে' হিড়্ হিড়্ ক'বে টেনে নিয়ে গিয়ে উঠোনে ফেলে মা এক প্রচণ্ড চড় তার পিঠে বসিয়ে দিলে; তাবপর সপ্তমে গলা তুলে আরম্ভ কব্‌লে—"তোর মেয়ের নিকুচি ক'রেছে! দিন দিন চাল্লী বাড়ছে, না? উনি ইস্কুলে পড়ে নবাবজাদী হ'য়েছেন! বিবির এখানকার ভাত মুখে বোচে না, কাজ কব্‌তে গেলে হাতে কুট্ হয়; আবার রবিবার কাজ কব্‌বেন না, গাওনা করবেন!"

সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠে মুষ্টিবর্ষণ ও পদাঘাত! আজ আহ্লাদী বিদ্রোহ কব্‌ল; হঠাৎ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মার হাত ছিনিয়ে ছুটে বাইরে গেল।

পেছন থেকে মা আশীর্ব্বাদ কব্‌ল, "বেরো বেরো, একেবারে কেওড়াতলায় যা! আর যেন তোর মুখ আমায় না দেখতে হয়!"

কেওড়াতলায় যেতে আহ্লাদী অবশ্য পার্‌ল না ; যাবার অন্য জায়গাও সম্প্রতি চোখে পড়ল না। পাঁচি মাসীর সঙ্গে তার মায়ের ক'দিন মনোমালিন্য হওয়ায় মাসীর বাড়ী যাওয়া তা'দের নিষেধ হ'য়ে গেছল। মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই হোক্ বা মাসীর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের জন্যই হোক সেই মাসীর বাড়ীর ভিতর ঢুকেই সে ডাক্‌লে—"মাসীমাগো!"

কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সকালবেলা হলেও মাসীর রান্নাবাড়ীর কোন উদ্যোগের চিহ্নও সে দেখতে পেল না। ভিতরের ঘরের দরজাটা ভেজান ছিল। সে ঘরে থাক্‌লে মাসী নিশ্চই উত্তর দিত! এমন ক'রে ঘরের দরজা খুলে হাট্ ক'রে রেখে মাসী কোথায় যে যেতে পারে—তাও সে ভেবে ঠিক্ করতে পারলে না। পুকুরের ঘাটে মাসী যে নেই তা' সে আস্‌বার সময়ই লক্ষ্য ক'রেছে। কৌতূহলী হ'য়ে ভিতরের দরজাটা ঠেল্‌তেই ভেতরের যে দৃশ্য তা'র চোখে পড়ল তা'তে তা'র সমস্ত কান্না এক পলকে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় পাঁচি মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। কোন নিদারুণ রোগে বিবর্ণ বিকৃত মুখের এক-পাশে গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল বোধ হয় ; এখন শুকিয়ে কালো চাপড়া বেঁধে গেছে। নিস্পন্দ দেহ দেখ্‌লে প্রাণ এখনও আছে কিনা সন্দেহ হয়। একটি কলসী কাত হ'য়ে পড়ায় সমস্ত ঘর জলময় হ'য়ে

গেছ্‌ল, এখনও সে জল শুকোয়নি। বোধ হয় জ্বরের মাঝে দুর্ব্বল হাতে জল গড়াতে যাওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে; শুধু গেলাসটা তখনও একটা হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল।

কিছুক্ষণ বিহ্বল বিমূঢ় আহ্লাদীর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। এই আকস্মিক আঘাতের প্রথম বিস্ময় ও বিহ্বলতা দূর হ'লে সে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার ক'রে ডাক্‌লে, "মাগো, বাবাগো, মাসীর কি হ'য়েছে দেখে যাও!"

—কুড়ি—

বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ করে' বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা তুপুর হয়ে গেলেও আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার। একঘেয়ে অস্বস্তিকর বাদ্‌লায় সহরটাকে অত্যন্ত পীড়িত শ্রীহীন অপরিষ্কার দেখাচ্ছিল। সজ্জিতা বারবিলাসিনীর মত যেন তার সমস্ত নকল ঔজ্জ্বল্যটুকু এই বাদ্‌লায় ধুয়ে গিয়ে কদর্য্যতা ও কুশ্রীতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অনতিবৃহৎ কাঠের একটা গাড়ীর মত লোহার চাকা দেওয়া ঘরে কাঠের লম্বা টেবিলের তু'ধারে বেঞ্চিতে ভীড় করে' গাড়োয়ানেরা চায়ের জন্যে বসে ছিল। গায়ে খাকি রঙের কোট, তার ওপর নম্বরী কাপড়ের গোল তালি। গাড়ীর আড্ডা অনবরত গাড়ী ঘোড়ার যাতায়াতে, কাদায়, ঘোড়ার ময়লায় ও ছেঁড়া ঘাসের জঞ্জালে একাকার,—একটা শ্বাসরোধকারী ঘোড়ার পচা-ময়লার তুর্গন্ধে সমস্ত জায়গাটা আমোদিত হয়েছিল। গাড়ীর আকারের কাঠের ঘরটার বাইরের দিকে একটা রঙ্‌চটা টিনের পাত আঁটা, তাতে অস্পষ্ট ছোট ছোট লাল হরপে Cabin for Hackney Carriage Drivers লেখা—ভেতরে একধারে একটা প্রকাণ্ড কেট্‌লীতে চুলোর ওপর জল গরম হচ্ছিল। বাদলায়—চায়ের এবং নেড়ো বিস্কুটের চাহিদা একটু বেশী। যে তুটি রোগা কালো কণ্ঠা-বেরনো ছেলে চা বিস্কুট সরবরাহ ও উচ্ছিষ্ট কাপ্ ধোয়ার

কাজ করছিল, তারা সে চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠ্‌তে পারছিল না। চা তৈরী করছিল কেবিনওয়ালা স্বয়ং—প্রৌঢ় মুসলমান, বেশ ভারিক্কিগোছের চেহারা ; গোঁফ দাড়ির পরিচ্ছন্নতা ও দেহের স্থূল বাঁধুনী ভারী ট্যাঁকের সাক্ষ্য দেয়। ভিতরে ও বাহিরে সমান গোলমাল। বাইরে গাড়ীর আড্ডার পাশে ভিজে ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গুটিকতক গাড়োয়ান বসে' একটি ভদ্রলোককে ঘিরে বচসা করছিল। সম্মিলিত আক্রমণে নিরীহ ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাইছিলেন, হঠাৎ তার ভিতর থেকে একজন গাড়োয়ান চিলের মত ছোঁ মেরে ঝড়ের বেগে তাঁর ডান হাতের কব্জিটা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়ীর ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে' বল্লে, "কোথায় সওয়ারী আছে বাবু?" নিরীহ ভদ্রলোকের সহরের অভিজ্ঞতা বোধ হয় খুব অল্প। খানিক কথা কইতে পারলেন না, তারপর যখন ঠিকানা বলবার মত জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন রুষ্ট গাড়োয়ানের দল দরজায় এসে ভীড় করে' দাঁড়িয়েছে।

একজন ধমক দিয়ে বল্লে, "আমি ত আগে দেড়টাকা বলেছি হুজুর,—আপনি যে ওর গাড়ীতে চড়্‌লেন?"

গাড়োয়ান তখন ঠিকানার অপেক্ষা না করে' একেবারে ওপরে উঠে ঘোড়ার লাগাম ধরে বসেছিল, বল্লে, "আরে আমিও দেড় টাকায় যাব—।"

কয়েকজন গাড়োয়ানের মধ্যে এই ছোঁ মারার অন্যায্যতা নিয়ে তর্ক চল্‌ছিল। যে গাড়ীতে তিনি উঠেছিলেন, সে গাড়ীর গাড়োয়ানের এই আকস্মিক লুণ্ঠন যত দোষেরই হোক্‌ না, ভদ্রলোক মনে মনে তাকে বোধ হয় এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ করবার জন্য আশীর্ব্বাদ করছিলেন। গাড়োয়ান ওপর থেকে আর একবার হাঁক্‌লে, "কোথায় যাব বাবু?"

ভদ্রলোক জানালেন।

একজন গাড়োয়ান ফুটপাথ থেকে বললে, "ও গাড়ীতে এই মাত্র মুর্দ্দা বয়ে আসছে বাবু।"

গাড়োয়ান ঘোড়াদুটোকে ছিপ্‌টি লাগিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে বল্লে, "তোর।"

ভদ্রলোক বুঝ্‌লেন কি না বলা যায় না। গাড়োয়ানদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে গেল।

* * * *

কেবিনের একপ্রান্তে একটা বেঞ্চির শেষে বসে অশান্ত কর্ম্মকার অন্যমনস্কভাবে কেবিনের কাঠের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। গাড়ীর আড্ডার এই সকল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা অবশ্য তার চোখে পড়ে নি। মনে মনে সে একটা চিঠির খসড়া করছিল। প্রতিবেশী গাড়োয়ানদের থেকে সামান্য পরিচ্ছন্নতা ছাড়া বেশ-ভূষার আর কোন পার্থক্য না থাক্‌লেও তার বিপুল আকারই তাকে বিশেষত্ব দান করেছিল। এই ছোট

ঘরে বামনের দলে তাকে অতিকায় দানবের মত দেখাচ্ছিল। সাম্‌নের টেবিলে অভুক্ত চায়ের কাপ পড়ে ছিল।

একে আলোকের অভাব, তার ওপর বিড়ির অজস্র ধোঁয়ায় ঘর আরো অন্ধকার। একটা ছোক্‌রা চাকর অসাবধানে কার পায়ে খানিকটা গরম চা ফেলে দিয়েছিল, তাই নিয়ে তুমুল হাঁকাহাঁকি চলেছে। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধাতেই অভ্যস্ত অশান্ত কর্ম্মকারের ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ষ্ট্যান্‌লির সঙ্গে বাঁকা বুড়ির মৃতদেহ দাহ কর্‌বার পর আর সে দেখা করেনি। তাকেই একটা চিঠি লেখার কথা ভাব্‌ছিল। ভাব্‌ছিল লিখ্‌বে,—"আমার ঠিকানা সে দিন আপনি জান্‌তে চেয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম ঠিকানা আমার নেই। ঠিকই বলেছিলাম, কিন্তু আজকাল কতক বিষয়ে আমার মত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, মনে হচ্ছে ঠিকানা না থাকা নিয়ে শ্লাঘা কর্‌বার কিছু নেই, এইবার ঠিকানা একটা কর্‌ব ভাবছি—"

সাম্‌নে অপর দিকে বেঞ্চির ওপর দুটো পা তুলে বসে অত্যন্ত অশোভনভাবে একটা আধা-বয়সী গাড়োয়ান অপরিষ্কার দাঁতের পাটি বার ক'রে দাঁত খুঁট্‌ছিল। অভুক্ত চায়ের কাপের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ অত্যন্ত পরার্থপর হ'য়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে' লাল-মাখান খড়্‌কে সমেত হাতটা দিয়েই অশান্তকে সচেতন ক'রে বল্‌লে,—"চা ঠো পিয়ে লে ভাই।"

অশান্ত মৃদু হেসে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক

দিলে। আরম্ভটা ঠিক তার পছন্দ হচ্ছিল না। আচ্ছা, লেখবার সময় একটু অন্য রকম ক'রে লেখা যাবে, ষ্ট্যান্‌লি যেন ভুল না বোঝেন। তারপর—"এক পলকে আদর্শ মানবসমাজ গড়ে ওঠে না। দু'হাজার বছর হ'তে চল্‌লো যিশু মানবের জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন; বুদ্ধ দেহ রক্ষা করেছেন আরো আগে। মানুষ আর কি কাঁদে না?...এমন কিছু দুঃখ আছে যা জীবনের অঙ্গ; সেটা অবশ্যম্ভাবী, সেটা আবশ্যকীয়, এমন কি সেটা না থাকলে জীবনের মূল্য থাকে না। সে দুঃখের জন্য মানুষ অশ্রুজল ফেলে, ফেলুক। কিন্তু যে সব দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য যুগে যুগে বুদ্ধ, খৃষ্টেরা প্রাণ দিয়েছেন সে দুঃখ অনিবার্য্য নয়। সে দুঃখের মূল মানবের অন্ধতায়, মানবের হৃদয়হীনতায়, তার পাশবিকতায়। সে মূল উচ্ছেদ করা সম্ভব হ'ল কি? খৃষ্ট ও বুদ্ধেরা একদিনে মানবসমাজকে চিরশুচি ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব চেয়েছিল এক যুগে পৃথিবীতে স্বর্গ আন্‌তে। এই অধৈর্য্যকে নিন্দা কর্‌বার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু এই অধীরতা যে নিষ্ফল এইটুকু বল্‌বার সাহস আমার আছে। আদর্শ মানবসমাজের জন্যে আদর্শ মানব দরকার। সমস্ত মানব একদিনে আদর্শ হ'য়ে ওঠে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের গতিবেগ নিয়মিত করে বটে।...তা ছাড়া আদর্শ অর্থে একটা কঠিন সুস্পষ্ট অবস্থা নয়, একটি তরল গতিশীল অনির্দ্দিষ্ট অবস্থা।...বাইরের ধাক্কায় মানুষকে আদর্শ হবার পথে ঠেলা যায়

না। যে ঠেল্‌তে যায়, সে প্রথমত নিজের অহঙ্কারে আপনাকে প্রকাণ্ড ক'রে দেখে, দ্বিতীয়ত মানুষের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার ও অসম্মান করে। যতবড় মনীষী, যত বড় সত্যদ্রষ্টা ঋষিই হোন না, মানুষ শুধু নিজের জীবনের উপলব্ধি থেকে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ইঙ্গিত কর্‌তে পারেন মাত্র, কিন্তু আদেশ করবার অধিকার কারো নেই।

আদর্শ মানবসমাজের জন্যে ব্যাকুলতা মানুষ আজ ত' সবে প্রকাশ করেনি। যুগে যুগে দেশে অসংখ্য রচনায় নানাভাবে এই সমাজের নক্সা আঁকা আছে। কিন্তু আপনি ত জানেন এই আদর্শ-বাদীদেরই অদের্শের মধ্যেও এত পার্থক্য যে "One man's heaven is another man's hell." মানুষের এই পার্থক্য,—এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করে, আদর্শ সমাজ গ'ড়ে উঠবে যে সমন্বয়ে তার রসায়ন কোন একজন মানুষের জানা নেই।..."

"চা'টা ত বরফ হয়ে গেল বাপু, আচ্ছা ভোলা লোক ত তুমি!" হিতৈষী গাড়োয়ান টেবিলের ওপর রক্ষিত চায়ের পেয়ালায় একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে তার উত্তাপ অনুভব ক'রে নিয়ে বল্লে, "সরবৎ হয়ে গেছে—ছ্যা!"

"যাক, ও চা আর খাব না।"

হঠাৎ এই উপদ্রবে বাধা পেয়ে অশান্তর চিন্তার ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হ'ল।—"আমি যাদের জীবন যাপন কর্‌ছি তাদের দেহের ও মনের কদর্য্যতা, গ্লানি, অপরিচ্ছন্নতা আমার প্রীতিকর

যে নয় একথা বলা বাহুল্য—শুধু অপ্রীতিকর নয়, সে কদর্য্যতা আমাকে পীড়িত করে। তবে কেন আমি এ-জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করেছি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমার উত্তর—পীড়িত হবার জন্য। এদের দৈহিক মানসিক নৈতিক দৈন্য ও স্বাস্থ্য-হীনতার পরিমাণ চাক্ষুষ উপলব্ধি করবার জন্য।...বাহিরে থেকে অত্যন্ত সবল কল্পনা নিয়েও এদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের পঙ্কিলতা অনুমান করা যায় না। তাই উপর থেকে পথ বলে যা নির্দ্দেশ করা যায়, এদের সাথে নীচে নেমে এসে দাঁড়ালে তার চিহ্নও পাওয়া যায় না। পথ-নির্দ্দেশের সার্থকতায় আমার বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে। আকাঙ্খা ডানা মুড়ে মাটিতে নেমে এসেছে। তাই ভাবছি ঠিকানা কর্‌ব একটা।...পায়ে যার জোর নেই তাকে টেনেটুনে কোন রকমে সোজা করে' দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়ত সম্ভব, কিন্তু সে অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। এদের শুধু পায়ের জোর নেইত বটেই, পায়ের ওপর ভর দিয়ে মানুষ হয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছাও মরে গেছে। বৃহত্তর সত্তার জন্য ব্যাকুলতা যদি এদের ভেতর থেকে না জাগে তাহলে বাইরে থেকে টেনে ঠেকা দিয়ে কতক্ষণ রাখা যাবে?......টেনে তুলতে আমি চাই না, ওদের জীবনের পাথেয় অনুযায়ী ওদের পঙ্গুতা দূর করে' ওদের সাথে হাত ধরে' এই অন্ধকার হতে পথ খুঁজতে চাই। পথ আমি জানি না এ-কথাটা এতদিনে নিজের কাছে স্বীকার করবার সাহস আমার হয়েছে। আমার মনে হয়,

আমি শুধু ক'টি চিরন্তন সত্যের দীপ পেয়েছি—আমি সেই মামুলি সত্যে বিশ্বাস করি যে, মানুষের সত্যকার মুক্তি তার নিজের ভেতরকার প্রেরণা ছাড়া আসে না,—আমি বিশ্বাস করি, অনাবৃষ্টির দুর্দ্দশা বন্যায় দূর হয় না—দেহের মত সমাজের বিস্ফোটক যখন প্রাণধারাকে দূষিত করে' নিশ্চল করে' তোলে তখন তাকে সবলে চেপে বসিয়ে দিয়ে সমাজকে নিরাময় করা যায় না, আগে তার বিষকে দূর করতে হয়।······আমার দায়িত্বের তুলনায় আমার শক্তি অত্যন্ত অল্প, কিন্তু কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহায়তার অপেক্ষায় বসে থাকা আমি নিষ্ফল মনে করি। প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধাই আমার খুব কম।······আমার সামনে একটি মাতাল গাড়োয়ান অনেক কিছু আস্ফালন করছে, অন্যান্য সকলে তার সেই প্রলাপ অত্যন্ত উপভোগ করছে······,এদের নিত্য জীবনের ভাষা যে দিনের পর দিন শোনেনি সে বুঝতে পারবে না কোন্ স্তরে এখনও এরা আবদ্ধ, অত্যন্ত স্থূল যৌন সম্বন্ধের কদর্য্যতা এদের সমস্ত মন কিরূপ অধিকার করে আছে। ভাষায় এদের ক্ষণেক্ষণে তারই প্রকাশ।···আমি চাই ওই বীভৎসতা, ওই পঙ্গুতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে' তুলে বিপুল অসন্তোষ তাদের মনে রোপণ করতে। বৃহত্তর সত্তার ব্যাকুলতা সেই অসোন্তষ থেকেই আসবে বলেই আমার বিশ্বাস। এর বেশী কিছু আমি আজও জানি না। দেহের শ্রমের পরিবর্ত্তে ওরা যা পায় জীবননির্ব্বাহের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়

তা আমি জানি এবং ওদের মানসিক ও নৈতিক দৈন্য যে আর্থিক দৈন্যের ফল তাও আমি মানি।

কিন্তু……” অশান্ত-র চিন্তাধারার হঠাৎ ছেদ পড়ল।

“তুমি ত আচ্ছা বেয়াক্কেল লোক বাপু! এক কাপ্ চা খেয়ে তিন ঘণ্টা ধরে' তিন জনের জায়গা দখল করে' বসে' থাক্‌লে' আর সব খদ্দের যায় কোথায়?”—কেবিনওয়ালা স্বয়ং এসে খিঁচিয়ে উঠল।

অশান্ত ধীরে ধীরে উঠে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল।

—শেষ—

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

অন্যান্য বই

কবিতা

প্রথমা
সম্রাট
ফেরারী ফৌজ
ইত্যাদি

গল্প

পুতুল ও প্রতিমা
অফুরন্ত ও অন্যান্য গল্প
ধূলি ধূসর
মৃত্তিকা
নিশীথ নগরী
বেনামী বন্দর
কুড়িয়ে ছড়িয়ে
সামনে চড়াই
ইত্যাদি

উপন্যাস

কুয়াশা
উপনায়ন
মিছিল
সসাগরা
আগামী-কাল
ময়লা কাগজ
ইত্যাদি

ছোটদের বই

পৃথিবী ছাড়িয়ে
পাতালে পাঁচ বছর
ময়দানবের দ্বীপ
ড্রাগনের নিশ্বাস
কুহকের দেশে

*

কুমীর কুমীর

*

দুঃস্বপ্নের দ্বীপ
ছোটদের সেরা গল্প
ঝড়ের কালো মেঘ
ভয়ঙ্কর
আজগুবি জানোয়ার
সাগর রহস্য
ইত্যাদি

ছায়া ছবির বই

প্রতিশোধ
দাবী
ভাবীকাল
নতুন খবর
সমাধান
পথ ভুলে
কালো ছায়া
হানাবাড়ি
ইত্যাদি